দেশ কাল পাত্র

অন্নদাশঙ্কর রায়

ডি এম লাইব্রেরী
কলিকাতা

স্বর্গত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
মহাশয়ের স্মৃতি

নিবেদন

"চেনাশোনা" দশ বছর আগের ভ্রমণকাহিনী। যথাকালে লিপিবদ্ধ না হয়ে যুদ্ধের মাঝখানে স্মৃতিলিখিত হয়। শেষ হলে আলাদা একখানি বই হতো, কিন্তু নানা বিক্ষেপে স্মৃতির সুতো কেটে যায়। পরে আর জোড়া দেবার চেষ্টা করিনি।

"রবীন্দ্রাদিত্য" বিশ বছর আগে "কল্লোলে" প্রকাশিত হয়। কল্লোলযুগের অন্যতম সাহিত্যিক বন্ধুবর ভূপতি চৌধুরীর সাহায্য না পেলে ওটি সংগ্রহ করা কঠিন হতো। "বার্ণার্ড শ" প্রকাশিত হয় চোদ্দ বছর আগে "পরিচয়" পত্রে। ওটি পাওয়া গেল বিখ্যাত সাহিত্যিক অগ্রজপ্রতিম মণীন্দ্রলাল বসুর ভাণ্ডারে। এঁদের দু'জনের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা। অক্ষরবিন্যাস শ্রীমান্ অজয়াশঙ্কর রায়ের।

অন্নদাশঙ্কর রায়

১৪ই চৈত্র ১৩৫৫

সূচী

অন্নদাশঙ্কর রায় প্রণীত

অন্যান্য প্রবন্ধের বই

তারুণ্য

আমরা

জীবনশিল্পী

ইশারা

বিনুর বই

জীয়নকাটি

ছোট গল্পের বই

প্রকৃতির পরিহাস

মনপবন

কবিতার বই

নূতনা রাধা

কামনাপঞ্চবিংশতি

দেশকালপাত্র

চেনাশোনা

১

এত কাল যার সঙ্গে ঘর করছি, এক একদিন তার দিকে তাকিয়ে মনে হয় না কি—কতটুকু এর চিনি!

তেমনি স্বদেশের।

স্বদেশকে আর একটু চিনতে চাই বলে বেড়াতে যাই। বেড়ানো বলতে বুঝি চেনাশোনা।

২

এমনি এক চেনাশোনার যোগাযোগ ঘটেছিল ১৯৩৮ সালে। আমরা বেড়াতে যাচ্ছি শুনে বম্বে থেকে শ্রীমতী সোফিয়া ওয়াডিয়া লিখলেন তাঁর অতিথি হতে।

বম্বে যতবার দেখেছি ততবার নতুন লেগেছে। তার সম্বন্ধে আমার মোহ চিরদিনের। ভারতে কতকটা বহির্ভারতের স্বাদ পাওয়া যায় একমাত্র সেই দ্বীপটিতে। সমুদ্রগামী পোত। বিস্তীর্ণ নীলাম্বু। দিগ্বলয়ে বহুদর্শী সহ্যাদ্রি। দিগ্বিদিকে নানা দেশের নরনারী। কত সাজ, কত রং, কেমন বাহার। মনে হয় আধাআধি বিদেশে এসেছি, এবার জাহাজে উঠতে পারলে পুরোপুরি বিদেশ। দেশেরও এমনতরো বিচিত্র সঞ্চয়ন আর কই?—ভারত দেখতে যাদের সময় নেই তারা যদি শুধু বম্বে দেখে, তাহলে ভারত দর্শনের ফল হয়।

শ্রীমতী সোফিয়ার স্বামী সেই প্রসিদ্ধ ওয়াডিয়া যিনি গত মহাযুদ্ধের মধ্যভাগে হোমরুল আন্দোলন করে মিসেস বেসান্টের সঙ্গে অন্তরীণ হয়েছিলেন। পরে ইনি পৃথক হয়ে যান, পৃথক একটি সংস্থা সংগঠন করেন। ইনি পারসী, এঁর সহধর্মিণী ফরাসী, কিন্তু উভয়েই গভীরভাবে ভারতীয়। স্বামী পরেন মোটা খদ্দরের পায়জামা পাঞ্জাবী, স্ত্রী মিহি খদ্দরের শাড়ি। এঁদের সঙ্গে এক বাড়িতে স্বতন্ত্র থাকেন যে কয়টি পরিবার ও ব্যক্তি, তাঁদের কেউ ইংরাজ, কেউ আমেরিকান, কেউ নরওয়েজিয়ান, কেউ পারসী। এঁরা সকলে কিছু ভারতীয় ধারায় জীবনযাপন করেন না, বৈদেশিক পদ্ধতিও চলে। তবে ভারতীয়তার মর্যাদা মানেন। টাউনসেণ্ড আপিস থেকে ফিরলে খদ্দরের পাঞ্জাবী পায়জামা পরে' ভারতীয় হয়ে যান। টেনব্রুকের ছেলে তাই পরে' ইস্কুলে যায়, মাথায় একটা গান্ধী টুপি। ছেলেটি গুজরাতী পড়ে, তার বোনটি তো পরিষ্কার গুজরাতী বলে।

ওয়াডিয়ারা নিরামিষাশী। শুধু তাই নয়, তাঁদের খোরাক খাদি ভাণ্ডারের ঢেঁকিছাটা বা হাতে-ছাটা চালের ভাত। তার সঙ্গে সংগতি রেখে ডাল তরকারি ফলমূল চাপাটি। আমাদের জিজ্ঞাসা করা হলো আমরা কোন্ রীতি পছন্দ করি। আমরা ছিলুম ঘোর আমিষাশী, কিন্তু অপাংক্তেয় হতে ইচ্ছা ছিল না। তাই ওঁদের রীতি বরণ করলুম। ভাগ্যক্রমে দেশী পোষাক সঙ্গে ছিল। নইলে আমার ময়ূরপুচ্ছ আমাকে নাকাল করত।

পাণ্ডে নামে এক ভদ্রলোক এসে আমাদের তত্ত্বাবধান করেন। ঠাওরেছিলুম কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ। চেহারাটাও অনেকটা সেইরকম বা তার চেয়ে ভালো। কিন্তু শুনে অবাক হলুম তিনি পারসী। পারসীদের নাম যে পাণ্ডে হয়, তা কী করে জানব? পরে একটি পারসী বিবাহে বরযাত্রী হয়ে পংক্তিভোজনে বসে দেখি পরিবেশকরা অবিকল রাঁধুনি

বামুন। অথচ পারসী। পারসীদের সবাই বড়লোক নয়। এমন কি মধ্যবিত্তও নয়। পাছে পরে লিখতে ভুলে যাই সেইজন্যে এখনি বলে রাখি যে, নেমন্তন্ন খেয়েছিলুম কলাপাতায়, যদিও টেবিলের ওপর। পারসীরা যে গোস্ত তা বোধ হয় অজানা নয়, কিন্তু ক'জন খোঁজ রাখেন যে তারা উপবীতধারী? তাদের বিয়ের মন্ত্র অংশত সংস্কৃত।

পাণ্ডে মহাশয়ের কাছে ছিল সেদিকার খবরের কাগজ। পড়লুম পণ্ডিত জবহরলাল নেহরুর প্রত্যাবর্তন সমাচার। পরের দিন তাঁকে আজাদ ময়দানে অভ্যর্থনা করা হবে। মনস্থ করলুম যাব। শুনতে হবে তাঁর স্পেনের অভিজ্ঞতা।

পৃথ্বীশ দাশগুপ্ত তখন বম্বেতে কাজ করেন, তাঁকে পাকড়ানো গেল। তিনি ও আমি আজাদ ময়দান অর্থাৎ এসপ্লানেড ময়দানে গিয়ে রবাহূতদের ভিড়ে দাঁড়ালুম। কিন্তু দাঁড়াতে দিলে তো? কংগ্রেসের ভলান্টিয়ার, পরনে খাকী শার্ট হাফ-প্যান্ট, পুলিসী স্বরে বললেন, "বৈঠ্ যাও!" রামরাজ্যে কেউ কাউকে 'আপনি' বলবে কি না বোঝা গেল না, অন্তত ভলান্টিয়ারের মুখে তার নমুনা ছিল না। বোধ হয় পোষাকটার স্বভাব এই যে, পরলেই মেজাজ গরম হয়ে ওঠে। লঙ্কায় গেলে যদি রাক্ষস হয়, তবে খাকী পরলে খোক্কস হয়।

ঘাসের ওপর পা মেলে দিয়ে আরাম করে বসবার মতো জায়গা যতক্ষণ খালি ছিল ততক্ষণ আমরা পণ্ডিতজীর প্রতীক্ষা করলুম। মঞ্চের উপর অধিষ্ঠিত স্থানীয় নেতারা জনতার ধৈর্য বিধান করতে গান জুড়ে দিলেন; তাতেও ধৈর্য রক্ষা হয় না দেখে শঙ্কররাওজী শুরু করে দিলেন বক্তৃতা। বাগ্মী বলে তাঁর প্রসিদ্ধি আছে, অযথা নয়।

আমাদের পাঠ্য জুটে গেল একখানি কমিউনিস্ট পত্রিকা। সেখানি কিনতে হলো একটি নীলকৃষ্ণ স্কার্ট পরা বালিকার কাছে। মেয়েটি পারসী কি মুসলিম কি হিন্দু তা বুঝতে দেওয়া হয়তো সাম্যবাদীদের

নীতিবিরুদ্ধ। অথবা যে-কোনো প্রকার ভারতীয়তাই তাদের পক্ষে আপত্তিকর ফ্যাসিস্টতা। আমার কিন্তু ধারণা, যে কারণে জাতীয় পতাকাধারীর অঙ্গে খাকী হাফ-প্যাণ্ট ও শার্ট, সেই একই কারণে রক্ত নিশানধারিণীর পরিধানে স্কার্ট। কারণটা আর কিছু নয়, শাসক ও শোষককুলের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার অভিব্যক্তি। আমরা ইংরাজকে চাইনে, কিন্তু ইংরেজীকে চাই। আমরা কায়ায় ইংরাজ নই কিন্তু মনোবাক্যে ইংরাজ।

তা কমিউনিস্টরা উদ্যোগী বটে। বাঘের ঘরে ঘোগের মতো কংগ্রেসী জনসভায় সাম্যবাদী ইস্তাহার। শুধু তাই নয়, কংগ্রেসের—অন্তত কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলীর—নিন্দাবাদ। তখনো আন্দাজ করিনি যে, কংগ্রেসের অভ্যন্তরে গৃহবিবাদের উদ্যোগপর্ব চলেছে। তখনো ত্রিপুরীর ঢের দেরী।

অন্ধকার হলো। জবহরলালজীর পথ চেয়ে আমাদের মুখচোখ লাল হলো। বেরিয়ে আসছি এমন সময় ব্যাণ্ড বেজে উঠল মনে পড়ে। নহবত নয়, লাউড স্পীকারে শোনা গেল তাঁর গম্ভীর কণ্ঠ, কিন্তু সন্ধ্যার আবছায়ায় স্পষ্ট দেখা গেল না তাঁর দণ্ডায়মান মূর্তি।

রাজপথের ওপর খাড়া হয়ে গৃহিণীদ্বয়ের জন্যে অপেক্ষা করছি, তাঁরা ছিলেন মহিলাবিভাগে। এবার রামরাজ্যের পুলিস নয়, সাম্রাজ্যের পুলিস এসে হটতে হুকুম দিল। বাপ রে! সে কি পুলিস সমাবেশ! পণ্ডিতজীর সম্বর্ধনার জন্যে কংগ্রেসমন্ত্রীরা স্বয়ং না আসুন, সান্ত্রী প্রেরণ করেছিলেন অগণ্য। গোরা সার্জেণ্ট এমন কড়া পাহারা দিচ্ছিল যে রাস্তায় একটিও পদাতিক ছিল না।

জীবনসঙ্গিনীদের সাক্ষাৎ পেয়ে জীবন ফিরে পাচ্ছি, হেনকালে আলাপ হয়ে গেল জবহরভগিনী কৃষ্ণার সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে আরো দু'একজন মহিলা ছিলেন, বোধ হয় সরোজিনী নাইডু মহাশয়ার ভগিনীও।

এঁদের কাছে সংবাদ মিলল যে, দিন দুই পরে ওয়েস্ট এণ্ড সিনেমায় চীন ও স্পেন বিষয়ক ফিল্ম প্রদর্শিত হবে। উপস্থিত থাকবেন ও উদ্বোধন করবেন জবহরলাল। টিকিট চেষ্টা করলে এখনো কিনতে পাওয়া যায়, সে ভার দাশগুপ্ত নিলেন। তিনি একটা ঘরোয়া নিমন্ত্রণের জোগাড়ে ছিলেন, কিন্তু শ্রীমতী কৃষ্ণা বললেন তাঁর দাদা দারুণ ব্যস্ত, স্পেনের জনগণের জন্যে এক জাহাজ খাদ্য পাঠানোর দায়িত্ব নিয়েছেন।

৩

ওয়েস্ট এণ্ড সিনেমায় ফিল্ম দুটি দেখানো হলো দুপুরের আগে। চীনের গেরিলা যুদ্ধ। চু তে। মাওৎসে তুং। স্পেনের ধ্বংসলীলা। নো পাসারান। রোমাঞ্চকর দৃশ্য। আমরা তো ছায়ামাত্র দেখে শিউরে উঠছি, ওদিকে ওরা বাস্তবের সঙ্গে হাতাহাতি করছে।

করবার কিছু নেই। শুধু অনুভব করি। সহানুভবী আমরা ঘরশুদ্ধ লোক। কারো মুখে পাইপ, কারো পরনে জর্জেট। বম্বের শৌখিন সমাজের অনেকেই সমুপস্থিত। গান্ধী টুপিও সংখ্যায় কম নয়। আবহাওয়াটা কস্‌মোপলিটান। সামনের সারিতে বসেছিলেন জবহরলাল, উঠে কয়েকটি কথা ইংরাজীতে বললেন। যাঁরা প্রত্যাশা করেছিলেন তিনি তাঁর স্পেনের অভিজ্ঞতা সচিত্র করবেন তাঁরা নিরাশ হলেন। তা বলে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। ওটা তো সভা নয়, ওখানে আমাদের কাজ ছবি দেখা। জবহরলালের সঙ্গে ছবি দেখা।

তিনি বাগ্মী নন। তাঁর বক্তৃতা যেন বক্তৃতা নয়, একটু উঁচু গলার কথাবার্তা। সম্ভবত আতসবাজির আর্ট তাঁর অজানা। মনে হলো বেশ সহজ সরল মানুষ তিনি। খেয়ালীও বটে। হঠাৎ এক সময় উঠে গেলেন, শুনলুম তাঁর ভালো লাগে না নিজের প্রশস্তি। সভাপতি না

কে যেন সেই সময় তাঁর গুণগান করছিলেন। দেখলুম তিনি বাইরে গিয়ে একটা সিগারেট ধরালেন।

সেদিন আলাপ হলো কয়েক জনের সঙ্গে। চীন ও স্পেনের জন্তে সত্যিকার মাথাব্যথা যাঁদের, তেমন কারো কারো সঙ্গেও। তাঁরাই এই প্রদর্শনীর উদ্যোক্তা, সংগৃহীত অর্থ চীনদেশে পাঠিয়ে তাঁরা মানবের প্রতি মানবকৃত্য করছেন। এই ফ্যাশনেবল জনতায় তাঁদের নিরাভরণ নির্জিত রূপ কেমন একটা করুণ ছাপ রেখে যায়। দরদী হবার অধিকার তাঁদেরই, আমরা তো সংসারী লোক। একটু পুণ্য করতে এসেছি।

পরের দিন আমাদের ডিনারের নিমন্ত্রণ ছিল ক্রিকেট ক্লাব অফ ইণ্ডিয়ায়। নিমন্ত্রাতা সরোজ চৌধুরী ক্লাবেই ঘরগৃহস্থালী পাতিয়েছেন। চির-কুমারের পক্ষে ওর চেয়ে আরাম আর নেই। সেকালের বৌদ্ধ বিহারের আধুনিক সংস্করণ এই সব ক্লাব, সঙ্ঘারামের আরাম তথা সঙ্ঘ দুই রয়েছে এতে।

অথচ হুবহু বিলিতী ব্যাপার, অফ ইণ্ডিয়াটুকু প্রক্ষিপ্ত। ক্রিকেট কথাটাও প্রক্ষিপ্ত না হোক, উৎক্ষিপ্ত। কারণ সেখানকার সভ্যেরা কদাচিৎ খেলোয়াড়, অধিকাংশই সামাজিকতার সুযোগসুবিধার দ্বারা আকৃষ্ট। কাজের সময় কাজ, ছুটির সময় ক্লাব, এই মহাতত্ত্ব জগতের প্রতি ইংলণ্ডের দান। পৃথিবীময় যার অনুকরণ হচ্ছে, ভারতে তার অনুকরণ মার্জনীয়।

চৌধুরী সুদীর্ঘকাল বম্বের নাগরিক। একটি ইংরাজ কোম্পানীর জেনারল ম্যানেজার। তথা পার্ট্‌নার। কলকাতা হলে এঁর মত বড়ো সাহেব বোধ হয় বাংলা বলতেন না, কিন্তু বম্বের একটা বিশিষ্টতা হচ্ছে এখানকার স্বাধীনজীবীরা স্বাধীনচেতা। বিদেশীর সঙ্গে সমান হতে গিয়ে এঁরা স্বজাতির নাগালের বাইরে চলে যান না। পক্ষান্তরে

পরদেশীর পরশ বাঁচিয়ে গদ্দির উপরে লক্ষ্মীর বাহনটির মতো রাতদিন বসে থাকেন না।

চৌধুরীর ডিনারে এক বাঙালীর মেয়ে আমাকে চুপি চুপি প্রশ্ন করলেন আমার সহধর্মিণীর সীমন্ত রক্তিম কেন?—আমি বললুম, ও যে সিঁদুর। তিনি জানতে চাইলেন, সিঁদুর কেন? আমার ধারণা ছিল হিঁদুর সঙ্গে সিঁদুর এমন অবিচ্ছিন্ন যে, ভূভারতে কেউ নয় সে বিষয়ে অজ্ঞ। খোঁজ নিয়ে বোঝা গেল তিনি কোনো দিন বাংলা দেশে যাননি, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিস্ময় দূর হয় না। বাংলা দেশে না যান, হিন্দুস্থানে তো রয়েছেন। আমার বন্ধুরা ব্যাখ্যা করলেন যে, সীমন্তে সিন্দুর পশ্চিম ভারতের প্রথা নয়, হিন্দুর সঙ্গে ওর সম্বন্ধ প্রাদেশিক সীমান্তেই নিবদ্ধ। তাই তো! পশ্চিম ভারতে এ প্রথা নেই, দক্ষিণ ভারতেও না। উত্তর ভারত সম্বন্ধে নিশ্চিত নই। তবে এটা বঙ্গের বিশেষত্ব। উৎকলেরও। বোধ হয় আসাম ও মিথিলারও। এসব প্রদেশ চীন-দেশের নিকটে বলেই কি? চীনদেশ থেকে খাঁটি সিঁদুর আসে বলেই কি? বলিদানের রক্ত কপালে মাখতে মাখতে সেই অভ্যাস থেকে এই অভ্যাস জন্মায়নি তো? তন্ত্রপ্রধান অঞ্চলে এর প্রাদুর্ভাব কি তন্ত্র-প্রভাবের সাক্ষী?

তার পরের দিন বিচারপতি সেন মহাশয়ের সদনে মরাঠী সাহিত্যিকদের আসরে আমার নিমন্ত্রণ। ক্ষিতীশচন্দ্র একদা রবীন্দ্রনাথের "রাজা" নাটকটি রাজভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। "বলাকা"র কয়েকটি কবিতার পদ্যানুবাদও তাঁর সুকৃতি। তাঁর আজকাল অবসর নেই, কিন্তু লেখার হাত এখনো আছে, চিঠিপত্রে ধরা পড়ে। তাঁর বাংলা লেখা তাঁর অন্তরঙ্গদের মনে এই জিজ্ঞাসা জাগায় যে, কেন তিনি এমন ক্ষমতার অনুশীলন করেন না? অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো যে রসপ্রবাহ তাঁর হৃদয় আর্দ্র করেছে, তাঁর আলাপ আলোচনাও সেই রসে

সিক্ত। বিচারপতি হয়ে তিনি মথুরাপতি হননি, সব বয়সের ও সব অবস্থার মানুষ তাঁর কাছে অভয় পায়, পায় আন্তরিক অমায়িকতা।

অভ্যাগতদের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন মামা বারেরকর। অন্তস্থ ব। মহারাষ্ট্রে তাঁর নাটকনাটিকার খ্যাতি তাঁকে সর্বজনের মাতুলসম্পর্কীয় করেছে। তাঁর পিতৃদত্ত নাম মামা নয়। মামা বারেরকর, কাকা কালেলকর, দাদা ধর্মাধিকারী—এ ধরনের সার্বজনীন সম্পর্কসূচক নাম মহারাষ্ট্রেই চলে। কেবল সাহিত্যক্ষেত্রে নয়, রাজনীতিক্ষেত্রেও। নানা সাহেব, নানা ফর্দনবীশ, এসব নাম এখন ইতিহাসের পাতায়। মাধব শ্রীহরি অণে মহাশয়কে বাপুজী অণে বলা হয়।

এটি সম্ভব সে প্রদেশের পদবীগুলি মুখুয্যে বাঁড়ুয্যে ঘোষ বোসের মতো সুলভ নয় বলে। বাংলা দেশের জনপ্রিয় লেখকদের মধ্যে অন্তত জন দুই চাটুয্যে, জন তিনেক মুখুয্যে, জনা পাঁচ ছয় বাঁড়ুয্যে ছিলেন ও আছেন। কাকেই বা মামা বলে ডাকি, কাকেই বা খুড়ো বলে? চাচা ইসলাম ও মামু আহমদ বললে কে কে সাড়া দেবেন? মরাঠি লেখিকারা পিতা ও পতির পদবী অম্লানবদনে আত্মসাৎ করেন। যথা কমলাবাই দেশপাণ্ডে। বাংলায় কিন্তু দেবীদের সংখ্যা তেত্রিশ কোটি না হোক তেত্রিশ তো বটেই। কা দেবী সর্বভূতানাং মাসীরূপেণ সংস্থিতা?

যা হোক, আমাদের মামা একজন প্রসিদ্ধ নাট্যকার। তাঁর সঙ্গে মহারাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে কথাবার্তা হলো। মামা বললেন, তাঁর প্রদেশে বাংলার মতো ব্যবসায়িক রঙ্গালয় নেই, যা আছে তা শখের। তাতে অভিনেত্রীর অভাব। মরাঠা মেয়েরা ইদানীং সিনেমায় যোগ দিচ্ছেন, তাঁদের অনেকেই কুলাঙ্গনা ও বিদুষী। কিন্তু থিয়েটারে একজনও প্রবেশ করছেন না। মামা চেষ্টা করছেন অন্তত একটি শখের সম্প্রদায় গড়তে। তাতে মেয়েরাও থাকবেন। এ হোলো চার বছর আগের হালচাল। ইতিমধ্যে হাওয়া হয়তো বদলেছে

মালাবার পাহাড়ের সমুদ্রতীর ছোটবড় শিলাখণ্ডে বন্ধুর। সেখানে বিহারের স্থান সংকীর্ণ, স্নানেরও পরিসর নেই। কোনো মতে একটা ডুব দিয়ে উঠে আসা তো স্নান কিম্বা অবগাহন নয়। চেষ্টা করলে সেখানেও প্রোমেনাড নির্মাণ করা যেত, কিন্তু জমির দাম এত বেশী যে বাড়ী তৈরির দিকেই নাগরিকদের ঝোঁক। তা ছাড়া পাহাড় ধোওয়া ময়লা জল সেখান দিয়ে নেমে সমুদ্রের জলে মেশে। সেটা অবশ্য বর্ষায়। অন্য সময়েও নর্দামার সঙ্গে সমুদ্রের প্রচ্ছন্ন সম্বন্ধ থাকায় মাঝে মাঝে একটা গন্ধ ওঠে, নাকে রুমাল দিতে হয়। এইসব কারণে কেউ সমুদ্রের ধারে ফিরে তাকায় না, বাড়ীগুলো পশ্চিমমুখী না হয়ে পূবমুখী। তবে সূর্যাস্তের বিশাল মহিমা উপলব্ধি করবার জন্যে বাতায়ন খোলা রাখে। আরব সাগরের সূর্যাস্ত ভারতবর্ষের একটা দৃশ্য।

মালাবার পাহাড়ের অপর প্রান্তের এক কোণে চৌপাটি। সেখানে বালুর উপর পায়চারি করে লোকজনের মেলায় আপনাকে মিলিয়ে দিয়ে সন্ধ্যাবেলাটা কাটে। মরাঠা মেয়েরা যায় খোঁপায় ফুলের মালা জড়িয়ে। সাদা ফুল। মাথায় কাপড় দেওয়ার বিধি কেবল বিধবাদের বেলায় মহারাষ্ট্রে। কারণ তাদের কেশদাম মুণ্ডিত বা কর্তিত। সাদা ফুলের কুণ্ডলী দেখে চমক লাগে, সৌরভে নিঃশ্বাস আকুল হয়। প্রকৃতির দেওয়া এই আভরণের কাছে সোনারূপা নিষ্প্রভ, আতর এসেন্স অকিঞ্চিৎকর। গুজরাতী পারসী ললনারা কিন্তু আমাদেরই মতো লজ্জাবতী ও সাজসজ্জায় কৃত্রিমতার পক্ষপাতী। তা হলেও গুজরাতীদের প্রসাধন তাদের ঐশ্বর্যের পরিচয় বহন করে না, তারা সুসংবৃত হয়েই সন্তুষ্ট। তাদের মধ্যে আমি এমন একটা সুষমার সন্ধান পাই যা

নিসর্গেরই দান। মহারাষ্ট্রীয়েরা বহু শতাব্দী ধরে মানুষ হয়েছে পাহাড়ে পর্বতে, গুজরাতীরা সমতলে ও সমুদ্রবক্ষে। পারসীদের বসনভূষণের সমারোহ বোধ হয় ইরানী উত্তরাধিকার। ধনের সঙ্গে ওর গভীর সম্পর্ক নেই, কেননা ধনিক পরিবারেও আমি অকপট সারল্য লক্ষ করেছি।

যাঁদের মোটর আছে তাঁদের মোটরে করে বেড়ানোর জন্যে মেরিন ড্রাইভ। সমুদ্রের পাড় ধরে এই সড়কটি আগে ছিল না, সমুদ্রকে হটিয়ে দিয়ে তার কবল থেকে যে জমিটুকু উদ্ধার করা হয়, এটি তারই সামিল। এক দিকে আরব সাগরের পশ্চাদ্ উপসাগর, ব্যাক বে। অপর দিকে অত্যাধুনিক হর্ম্য। কোনোটি সদ্য নির্মিত, কোনোটি অসমাপ্ত। কালক্রমে এটি মালাবার পাহাড়েরই মতো ফ্যাশনেবল জনারণ্য হবে, মোটরিস্টদের ভূস্বর্গ।

ব্যাক বে দেখে তৃপ্তি হয় না। আমার ভালো লাগে মুক্ত পারাবার। খিড়কির চেয়ে সদর শ্রেয়। সদরের খোঁজে একদিন আমরা শহরের উত্তরে যাত্রা করলুম, হাজির হলুম জুহুতে। জুহুর সমুদ্র পুরীর মতো অবারিত, প্রশস্ত বালুশয্যা দিগন্তে মিশেছে। দূর থেকে অয়শ্চক্রের মতো দেখায় কি না জানিনে, কিন্তু বেলাভূমি বঙ্কিমাকৃতি। তমালতালী-বনরাজি না হোক, নারিকলসারি ঘন সাজে সেজেছে। পাশাপাশি অনেকগুলি বাংলো, কোনোটি যথেষ্ট জায়গা জোড়েনি, গাছের ছায়ায় ঝাড়ের মতো গজিয়েছে। তাদের এক টেরে ঘোষ বলে একজন ইঞ্জিনিয়ার বাস করেন, কাজ তাঁর জুহুর এরোড্রোমে। ঘোষ তখন কাজে বেরিয়েছেন, খবর পাননি যে আমরা আক্রমণ করছি। ঘোষের কেউ নেই, জুহুর সেই হুহু করা হাওয়ায় নারিকেলের পল্লবমর্মরে তাঁর সেই ঘোষবতী বীণার মতো কুটীরখানিতে চিরন্তন উদয়নের চির নূতন ঝংকার উঠছে—শূন্য মন্দির মোর। শূন্য মন্দির মোর।

মানুষের অদৃষ্টে সুখ নেই। সাধ ছিল জুহুতে ঢেউয়ের পিঠে সওয়ার হয়ে সাঁতার কাটব। শুনলুম ঢেউ যেখানে আছে তত দূর গিয়ে কেউ কেউ আরো দূরে চালিত হয়েছে জলজন্তুর জলপানি হতে। শুনে আর সাঁতার কাটা হলো না। হাঁটুজলে হামাগুড়ি দিয়ে জলকেলি সাঙ্গ করলুম। তার পরে ঘোষের চৌবাচ্চায় আমার তিন বাচ্চার অনধিকার প্রবেশ ও অঙ্গ প্রক্ষালন। তবে দিনটা মন্দ কাটল না। বালুর উপর ঝিনুক কুড়ানো, বাড়ী বানানো, পায়চারি থেকে ছুটোছুটি সবই করা গেল সপরিবারে ও সবান্ধবে। দাশগুপ্তরা ছিলেন, চৌধুরীও।

জুহুর সঙ্গে জুজুর সম্পর্ক কাল্পনিক না বাস্তবিক তা বোঝা যায় না, যখন দেখি জেলেরা ঢেউয়ের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে, জেলেনীরা জাল ধরে টানছে। ভয়ংকরের প্রতি ওদের ভ্রূক্ষেপ নেই। ভাবছিলুম নারী তো পুরুষের বহিঃসঙ্গিনীও বটে, শুধু গৃহসঙ্গিনী নয়। শ্রমিক শ্রেণীতে এটা স্বতঃস্বীকৃত, যত বিতর্ক কেবল পরাসক্ত শ্রেণীর বেলায়। পুরুষেরা পরগাছা বলে মেয়েরাও পরগাছা।

সেদিন জুহু থেকে ফিরে বেশ পরিবর্তন করে বরযাত্রী হতে হলো। নিমন্ত্রণ করেছিলেন জহাঙ্গীর ব্যাঙ্কার ও তাঁর পত্নী। তাঁদের পুত্র হোমির শুভ বিবাহ। নিমন্ত্রণপত্রে কন্যার নাম তো ছিলই, ছিল কন্যাকর্তা ও কন্যাকর্ত্রীর নামও। নিমন্ত্রণপত্রটি ইংরাজী ভাষায়। বরের ভগিনী থিয়সফিস্ট, সম্ভবত ওয়াডিয়াদের জ্ঞাতি। তিনিই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন বিবাহমণ্ডপে।

পারসীদের বিবাহ হয় এমন একটি স্থানে যেটি বরপক্ষ বা কন্যাপক্ষ কারো নিজস্ব সম্পত্তি নয়। খ্রীস্টানদের যেমন গির্জায় গিয়ে দু'পক্ষের মিলন হয় পারসীদের তেমনি এক বারোয়ারিতলায়। তার মালিক পারসীসমাজ। আমরা যেখানে নীত হলুম সেখানটার নাম অল ব্লেস

বাগ। All-Bless একটি ইংরাজী সমাস, মানে সর্বমঙ্গল। শোনা যায় এক পারসী কুবেরের ঐ পদবী ছিল, তিনিই সমাজকে ঐ ভূখণ্ড দান করে গেছেন। আর baug মানে বাঘভালুক নয়, বাগবাগিচা। যেমন আরামবাগ। ভূখণ্ডের উপর মণ্ডপ ও অন্যান্য কয়েকটি ভবন বিবাহকালে ব্যবহার করার অধিকার যে কোনো পারসীর আছে, তবে তার জন্যে অনুমতি নিতে হয় ন্যাসীমণ্ডলীর। বোধ হয় কিছু চাঁদাও দিতে হয় ব্যবহারের বিনিময়ে। এই রকম বাগ বম্বে শহরে আরো কয়েকটি আছে, নইলে এক রাত্রে একাধিক শুভকর্ম অসম্ভব হয়ে দাঁড়াত।

মণ্ডপের প্রাঙ্গণে সারি সারি চেয়ার, লক্ষ করিনি কোনগুলি কোন পক্ষের। মনে হলো তেমন কোনো সীমানির্দেশ নেই, উভয়পক্ষের যাত্রীযাত্রিণীরা নির্বিশেষে সমাসীন। আমরা গিয়ে দেখি প্রভূত জনসমাগম। প্রায় সকলেই পারসী। ব্যাঙ্কার ও তাঁর সহধর্মিণী এসে অভ্যর্থনা করলেন, ঠাঁই করে দিলেন সামনের দিকে। তাঁরা যে কেবল ভদ্র তাই নয়, অত্যন্ত সরল ও স্নেহশীল। নানা ভাবে পশ্চিমের অনুকরণ করলেও অন্তরে তাঁরা পূবদেশী। আমার তো এক বারও বোধ হলো না যে ইউরোপে এসেছি। ঠাট বদলেছে, কিন্তু প্রাচ্য আন্তরিকতা তেমনি রয়েছে। তেমনি মাসীপিসীর মতো মানুষটি বরের মা। তাঁর কোথাও একরত্তি মেমসাহেবিয়ানা নেই।

পারসীদের সকলের পরিধানে সাদা পোষাক। আমিই একমাত্র কৃষ্ণ মেষ। সারাক্ষণ কুণ্ঠিত ভাবে বসেছিলুম, কী দেখলুম কী শুনলুম সব স্মরণ নেই। মণ্ডপের তিন দিকে জুঁই ফুলের সাজসজ্জা, এক দিক খোলা। সেটি অবশ্য সামনের দিক। মণ্ডপে আসবার পথে বরের মায়ের সঙ্গে কনের মায়ের ডালিবিনিময় হলো। ডালিতে ছিল শাড়ী, নারিকেল ইত্যাদি। তার পরে বরের মা দিলেন কনেকে

উপহার, আর কনের মা বরকে। তার পরে বর-কনে গিয়ে বসলেন মণ্ডপের উপর দুখানি উচ্চাসনে। যেন রাজা-রাণী। দুজনের দুদিকে দু' পক্ষের পুরোহিত দাঁড়িয়ে। বরের কাছে কনেপক্ষের পুরোহিত, কনের কাছে বরপক্ষের পুরোহিত। পুরোহিত ব্যতীত আরো দুজন ছিলেন, সাক্ষী কিংবা best men। পুরোহিতেরা পরম উৎসাহে বরকন্যার অঙ্গে তণ্ডুল নিক্ষেপ করতে থাকলেন, উচ্চারণ করতে থাকলেন অবেস্তার মন্ত্র। মন্ত্রের মধ্যে সংস্কৃত ছিল। বোধ হয় দীর্ঘকাল ভারতে বাস করে ওটুকু গ্রহণ করা হয়েছে। অথবা হিন্দু ও ইরানী উভয়েরই পূর্বপুরুষ এক, ভাষাও মূলতঃ তাই। যা হোক পুরোহিতদ্বয়ের পরাক্রম দেখে স্থির করলুম পরজন্মে পারসী হব না। হলে তো কানে ঢুকবে মন্ত্রের বুলেট, চোখে বিঁধবে চালের কার্তুজ। রাজা হয়ে মজা নেই, যদি রানীর পুরোহিত ঢিতে বিপরীত করেন।

এর পরে সিভিল রেজিস্ট্রেশন। দেখা গেল পারসীরা কোনো অনুষ্ঠান বাদ দেননি। তা হোক, সবই সংক্ষিপ্ত। হিন্দু বিবাহের তুলনায় সময় লাগল সিকির সিকি ভাগ। মাঝে মাঝে নহবতের বদলে ইউরোপীয় নাচের অর্কেস্ট্রা বাজছিল। শেষ হলো যতদূর মনে পড়ে ইউরোপীয় কণ্ঠসংগীতে। অতঃপর পংক্তিভোজন। সারি সারি টেবিল চেয়ার, বিরাট ব্যাঙ্কেট। তবে ঐ যে—কলার পাতায় বিলিতী ফলার। বিলিতী মদিরাও ছিল, খুরিতে কি কাঁচের গ্লাসে ঠিক স্মরণ নেই। হাঁড়ি হাতে রাঁধুনী বামুন গম্ভীর ভাবে চলছেন সামনে দিয়ে, হাতা দিয়ে তুলে দিচ্ছেন যার যা দরকার। দেশী বিদেশী হিন্দু খ্রীস্টান বিভিন্ন আচার মিলিয়ে সে এক অপূর্ব সমন্বয়। যেমন কসমোপলিটান বম্বে শহর তেমনি কসমোপলিটান তার অগ্রণী সম্প্রদায়।

হোমি ও তাঁর সদ্যপরিণীতা বধূ ভোজনরতদের তত্ত্বাবধান করে

গেলেন। এক সঙ্গে বৌভাত সারা হলো। সময়সংক্ষেপের মতো ব্যয়সংক্ষেপও ঘটল। পারসীদের কাছে আমাদের অনেক শেখবার আছে, তবে ঐ নাচের অর্কেস্ট্রাটি বাজে খরচ। বিদায়কালে ব্যাঙ্কার-গৃহিণী ও তাঁর কুমারী কন্যা আমাদের গলায় মালা পরিয়ে দিলেন সযত্নে। এটি বড় সুন্দর প্রথা। যেমন সুন্দর ঐ যূথিকাবিতান।

সন্ধ্যায় আরম্ভ, রাত দশটায় শেষ। উৎসব বলতে আমি এই বুঝি, যাতে নিদ্রার ব্যত্যয় নেই। পারসীরা কাজের লোক, রাতের ঘুম মাটি হলে দিনের কাজ মাটি হবে, এটুকু বিবেচনা আছে। তাই উৎসবকে অনিয়ম বলে ভুল করেনি। কিন্তু একান্ত নিঃশব্দপ্রকৃতি তারা, এত বড় উৎসবেও কলরব করেনি। আমি কিন্তু হৈ চৈ ভালোবাসি। বিয়ের সময় না হোক, ভোজের সময়।

৫

শহরের সাহিত্যিক ও সাহিত্যে আগ্রহীদের সঙ্গে যাতে আমাদের আলাপ পরিচয় হয় তার জন্যে একটি উদ্যান সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন শ্রীমতী সোফিয়া ওয়াডিয়া। যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে গুজরাতী সমালোচক ঝাবেরীর ও গুজরাতী লেখিকা লীলাবতী মুন্‌শীর প্রদেশের বাইরেও সুনাম আছে। লীলাবতীর স্বামী কনৈয়ালাল কংগ্রেসমন্ত্রীমণ্ডলীর উজ্জ্বলতম রত্ন। তিনি যে গুজরাতী সাহিত্যেরও উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক এ সংবাদ সকলে রাখে না। উপরন্তু তিনি একজন সমাজসংস্কারক। অসবর্ণ বিবাহের পথিকৃৎ। সেদিন তিনি শহরে ছিলেন না।

তৈয়বজী পরিবারের ফৈয়জ ও তাঁর পত্নী সেখানে ছিলেন।

বঙ্গের মুসলমানদের এক প্রকার বিশিষ্ট পরিচ্ছদ আছে, ফৈয়জ তাই পরেছিলেন। আচকানের বদলে আলখাল্লার মতো, ফেজের পরিবর্তে সোনালী পাগড়ি, যত দূর মনে পড়ে। তাঁর পত্নীর পরিধানে শাড়ী। তবে তাতেও বোধ হয় বিশেষত্ব ছিল। শাড়ী আজকাল সকলেই পরেন, কিন্তু পারসীরা যেমন করে পরেন মুসলমানেরা তেমন করে পরেন না, গুজরাতীরা যে ঢঙে পরেন মরাঠীরা সে ঢঙে না। ক্রমশ একটা নির্বিশেষ রীতি বিবর্তিত হচ্ছে সেটা বিলেত না গেলে মালুম হয় না। সেখানে ভারতীয় মহিলা মাত্রেরই নিখিল ভারতীয় রীতি।

আর ছিলেন কুমারাপ্পাদের এক ভাই, সস্ত্রীক। এঁরা শ্রমিকদের বস্তিতে কর্মীদের শিক্ষালয় চালান। মিসেস নাযার। এঁর স্বামী ডাক্তার নায়ার ছিলেন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ, প্রায় সমস্ত সম্পত্তি দান করে গেছেন চিকিৎসা ও শুশ্রূষার জন্যে। এক হাসপাতাল, একটি মেডিকেল স্কুল না কলেজ, এমনি আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠান চলে তাঁর সদাব্রতে। কোযাসজী জহাঙ্গীর-ভগিনী মিসেস সবাওযালা। অল্পবিত্ত পারসী মহিলাদের জন্তে ইনি ও এঁর সহকর্মিণীরা মিলে একটি শিক্ষাসত্র খুলেছেন, সেখানে যতরকম হাতের কাজ শেখানো হয়। হাজার হাজার পারসী দুপুর বেলা আপিসে বসে এঁদের কাছ থেকে কেনা টিফিন খেয়ে এঁদের সাহায্য করেন। বহু পারসী পরিবারে এঁরা কেক বিস্কুট জ্যাম জেলি সরবরাহ করেন। শাড়ী বোনা, শাড়ীর পাড় তৈরি, দরজির কাজ, সূক্ষ্ম সেলাই, মাখন তোলা প্রভৃতি অনেক গুলি ব্যাপার এঁদের আটটি বিভাগকে ব্যাপৃত রাখে। এই ভাবে অসংখ্য মেয়ে দিনে অন্তত আট আনা রোজগার করে। একটি বাড়ীর চারটি মেয়ে মিলে দিনে দুটি করে টাকা রোজগার করলে মাসে অন্তত পঞ্চাশটি টাকা। দক্ষতা অনুসারে উপার্জন বাড়ে।

পরিচয় দিতে দিতে নিতে নিতে পার্টির হাট ভাঙল। হাটের

মতো পার্টিও ভাঙে আরেক দিন জোড়া লাগতে। সেদিন আমাদের নিমন্ত্রণ করে গেলেন শ্রীমতী লীলাবতী মুন্‌শী। মুন্‌শীরা বাড়ী করেছেন ওর্লি শহরতলীতে। সমুদ্রের ধারে প্রোমেনাড, তার ওধারে বাড়ী। কনহাইয়ালাল বাড়ী ছিলেন না, মন্ত্রীর কাজে যন্ত্রের মতো ঘুরছিলেন মফঃস্বলে। সাহিত্য সম্বন্ধে যে দুচার কথা হলো তার এইটুকু স্মরণ আছে যে বাংলার মতো গুজরাতীতেও আধুনিকতার বাহন হয়েছেন প্রাচীন সংস্কৃত। গান্ধীজী যে পরামর্শ দিয়েছিলেন প্রাকৃত জনের খাতিরে প্রাকৃত ভাষায় লিখতে সে পরামর্শ শিকায় তোলা রয়েছে। উন্নততর ভাব প্রকাশ করতে গেলে দুরূহতর শব্দ ব্যতীত গতি নেই, এই স্বীকৃতি কেবল বাঙালী লেখকদের মুখে নয়, গুজরাতী লেখকদেরও মুখে। আমি যত দূর দেখতে পাচ্ছি, এই গতিহীনতা থেকে আসবে প্রগতিহীনতা, ঘটবে চক্রগতি। অভিধান থেকে নয়, সাধারণ ব্যবহার থেকে সংগ্রহ করতে হবে চিন্তার বাসা বাঁধবার খড়কুটো। চিন্তা একেই আকাশচারী, তার বাসা বা ভাষা যদি আকাশে হয় তবে মাটির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই থাকে না। মানুষের তা ফানুস ওড়ানো।

এই সময় ক্রিকেট ক্লাব সংলগ্ন ব্রেবোর্ন স্টেডিয়ামে খেলা চলছিল হিন্দু মুসলমানে। পেণ্টাঙ্গুলার বা পঞ্চকোণী ক্রিকেট বম্বের বিশেষত্ব। সম্প্রতি করাচী প্রভৃতি স্থলেও এর প্রসার ঘটেছে। হিন্দু মুসলমান পারসী ইউরোপীয় এই চারটি দল ছিল আগে, এখন হয়েছে দেশীয় খ্রীস্টান এবং আরো কয়েকটি সম্প্রদায় মিলে পঞ্চম দল। ইংরাজেরা যদিও ভারতের মালিক তবু ক্রিকেটের উপর তাদের ভাগ্য নির্ভর করে না। তারা সচরাচর হারে ও তার দরুন লজ্জার ধার ধারে না। কিন্তু হিন্দু মুসলমানের এ নিয়ে উত্তেজনার ও মর্মবেদনার অবধি নেই। সারা বছর ধরে তারা দিন গুনতে থাকে কবে খেলা হবে, কবে দিল্লীর সিংহাসন ফিরে পাবে। আমি যেদিন খেলা দেখতে যাই সেদিন হিন্দু

মুসলমানে ফাইনাল খেলা, চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধ। হিন্দুরা দারুণ হারছিল, এমন অকারণে হারতে কখনও কাউকে দেখিনি। সম্ভবত ক্যাপটেনের উপর রাগ করে তারা নিজেদের নাক কাটছিল। মুসলমানেরা ব্যাট হাতে যেই দৌড় দেয় অমনি মুসলিম দর্শকদের তালে তালে তালি বাজে। হিন্দুর বলে যেই মুসলমান আউট হয় অমনি হিন্দু দর্শকদের করতালিতরঙ্গ উত্তাল হয়ে ওঠে। তালির সাহায্যে যদি খেলোয়াড়দের জিতিয়ে দেওয়া যেত হিন্দু মেজরিটির তালপরিমাণ তালি সেদিন তৃতীয় পাণিপথের শোধ তুলত। কিন্তু পাণির পথে পাণিপথ জেতা যায় না।

৬

পারপিয়া গুজরাতী মুসলমান। তাঁর পূর্বপুরুষ বাণিজ্য করতে চীন দেশে গিয়ে সাত দরিয়ার পার পেয়েছিলেন, সেই থেকে বংশপদবী "পারপিয়া"। যাঁর কথা লিখছি তিনি আমার সঙ্গে সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করেন, আমরা দু'জনে একই জাহাজে তিন দরিয়ার পার পাই।

সপত্নীক পারপিয়া একদিন সপত্নীক আমাকে তাজমহলে নিয়ে গেলেন, অর্থ হোটেল। গড়নটা যথাসম্ভব পূবদেশী, তাজমহলের সঙ্গে ভাসা ভাসা সাদৃশ্য আছে। ভিতরে বিলিতী খানাপিনা গানবাজনা আদবকায়দা। স্বয়ং শাজাহান এলে মোগলের ঘরে খোগলকে দেখে চমকে উঠতেন। এটি বোধ হয় একমাত্র ভারতীয় হোটেল যেটি পশ্চিমকে পরাস্ত করেছে তার নিজের খেলায়। মালিকরা পার্সী, তাঁরা পরিচালনার দিক থেকে কোথাও কোনো খুঁত রাখেননি।

তাই সাহেবলোকেরাও সমুদ্রযাত্রার আগে এইখানে বসে সমুদ্রের সৌন্দর্য পান করেন, সমুদ্রযাত্রার শেষে এইখানে শুয়ে বাদশাহী স্বপ্ন দেখেন।

সেই যে মিসেস নায়ারের কথা বলেছি একদিন তাঁর ওখানে নিমন্ত্রণ। তিনি মহারাষ্ট্রীয়া, তাঁর স্বামী ডাক্তার নায়ার ছিলেন যত দূর মনে পড়ে কেরলপুত্র, জামাতা ডাক্তার বেঙ্কটরাও কর্ণাটকী। এঁরা বৌদ্ধ। কিন্তু প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধদেরই মতো হিন্দুসমাজের থেকে অবিচ্ছিন্ন। এঁরা একরকম একাকী একটা হাসপাতাল চালান। হাসপাতালটির নাম বাই যমুনাবাই হাসপাতাল। এখানে জাতিভেদ বা ধর্মভেদ নেই, কাউকে বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করারও অভিসন্ধি নেই। বিশুদ্ধ মানবসেবা এর আদর্শ। হাসপাতালটির যেখানে অবস্থান সেখানটি ধ্বনিবিরল ও নিভৃত। বেঙ্কটরাও আমাদের ঘুরিয়ে দেখালেন। ঘুরতে ঘুরতে আমরা হাজির হলুম হাসপাতালসংলগ্ন বৌদ্ধবিহারে। সেখানে আবিষ্কার করলুম দুটি সন্ন্যাসীকে।

একজনের নাম লোকনাথ। ইনি ইতালীয় বৌদ্ধ। এঁর কর্মস্থল ছিলো আমেরিকা, ইনি রাসায়নিক ছিলেন। যুদ্ধকালে মানবধ্বংসী বহু প্রক্রিয়া উদ্‌ভাবন করে পরে এঁর পরিতাপ জন্মায়। তারপর থেকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছেন। রাত্রে নাকি আসনে বসে নিদ্রা যান।

অপর জনের নাম সদানন্দ। ইনি জার্মান বৈষ্ণব। ইনি কেন সংসার ত্যাগ করলেন জানিনে। বয়স অল্প। বেশ বাংলা বলেন, চৈতন্যচরিতামৃত পড়েছেন। চেহারাও কতকটা বাঙালী বৈষ্ণবের মতো হয়েছে, দেখে বিশ্বাস হয় যে ইনি গৌরভক্ত। মানুষ কত সহজে বিদেশকে স্বদেশ করতে পারে তার দৃষ্টান্ত আগেও দেখেছি, তাই আশ্চর্য হইনি। পারবে না কেন? সবই তো মানুষের দেশ। পারে না তার কারণ অক্ষমতা নয়, অনিচ্ছা। অথবা সুযোগের অভাব।

অভিপ্রায় ছিল বম্বের শ্রমজীবী অঞ্চলে ঘোরাফেরা করব, স্বচক্ষে দেখব তারা কী ভাবে থাকে। এই সম্পর্কে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে কার্নিক নামে এক ভদ্রলোক এলেন। তাঁর কাছে যেসব তথ্য পাওয়া গেল তাতে আমার স্বদেশের ধনিকদের প্রতি টান কিছু শিথিল হলো। এখন থেকে বলা যেতে পারে, বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যঃ ধনিকুলেষু চ। তাঁদেরও স্বদেশবিদেশ নেই, লাভের অঙ্কই ইষ্টদেবতা। সেই অপদেবতার পায়ে শ্রমিকের বলিদান যেমন বিদেশী কলে তেমনি স্বদেশী কলে। সরকারী আইনকেও যে তাঁরা কী ভাবে ফাঁকি দেন কার্নিক তা বিশদ করলেন। শ্রমিকদের একমাত্র অস্ত্র তো ধর্মঘট। সেই অস্ত্রের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগসত্ত্বেও তারা যে তিমিরে সেই তিমিরে। বরং তাদের কারো কারো অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে। দশ বারো বছর ধরে তারা বেকার।

অধ্যাপক অলতেকর শহরতলিতে থাকেন। শহরতলির নাম ভিলে পার্লে। এটা কোন্ দেশী নাম জানিনে। বোধ হয় পর্তুগীজ। একদিন আমাকে তাঁর বাড়ী নিয়ে গেলেন মধ্যাহ্নভোজনে। দেশী মতে অর্থাৎ মরাঠী মতে রান্না। গৃহিণীর স্বহস্তে পাক। পিঁড়িতে কি আসনে বসে খাওয়া গেল, পরিবেশনও গৃহকর্ত্রীর স্বহস্তে। এঁরা প্রাচীনপন্থী, প্রাচ্য আতিথেয়তার সবটুকু সৌন্দর্যের অধিকারী। ভাষার অভাব যে কত বড় অভাব, অনুভব করি যখন ভালো লাগা বোঝাতে চাই। আমার জানা ভাষা কর্ত্রীর অজানা। অধ্যাপকের কাছে পাঠ শিখে নিয়ে তবে মুখরক্ষা। বর্গীর হাঙ্গামার সময় থেকে মরাঠাদের সম্বন্ধে আমাদের একটা পরম্পরাগত ভীতি আছে। সেই যে "বর্গী এলো দেশে" বলে ছেলেভুলানো ছড়া, তার প্রভাব আমার মনের উপর বহুকাল ছিল। এবার তাঁদের সঙ্গে ঘরোয়াভাবে মিশে, কফি খেয়ে, সাহিত্যালাপ করে মনের উপর থেকে পর্দা সরে গেল। বিচারপতি সেন

মরাঠাদের বিশেষ ভালোবাসেন, আমিও অল্প কালের মধ্যে তাঁদের পক্ষপাতী হয়ে উঠি। কেন, কী করে বলব? একটা কারণ বোধ হয় তাঁদের বিদ্যানুরাগ। বিদ্যার জন্যে বিদ্যা ক'জন চায়? মরাঠাদের মধ্যে যে বিদ্যানুরাগ লক্ষ করলুম তা দেশানুরাগের মতো জ্বলন্ত ও নিস্পৃহ।

পারপিয়ারা আমাদের উইলিংডন ক্লাবে নিয়ে গেলেন। বম্বের ইঙ্গবঙ্গদের প্রধান ঘাঁটি। নাচ চলছিল ল্যামবেথ ওয়াক কি রুম্বা। পারপিয়ারা আমাদের ডাকলেন, কিন্তু আমরা ও রসে বঞ্চিত। দেখতে না দেখতে তাঁরা ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন, আমরা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম। অপরূপ পাগড়ি মাথায়, কী একটা পোষাক পরে কয়েকজন কচ্ছী জমিদার এসে আমাদের কাছাকাছি আসন নিলেন, শুনলুম মুসলমান। যাঁদের সঙ্গে বসলেন তাঁরা হিন্দু। নাচিয়েদের দলে পার্সী স্ত্রীপুরুষও ছিলেন। কসমোপলিটান আসর।

৭

বম্বে থেকে পুনা যেন কলকাতা থেকে আসানসোল। রাঁচি বলতে পারলে দূরত্বের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুরত্বের আভাস দেওয়া চলত। ভয় ছিল শীতে হয়তো জমে যাওয়া যাবে, কিন্তু তেমন কিছু ঘটল না। বরং [illegible] গরমের পর পুনার ঠাণ্ডা আমাদের জানিয়ে দিল যে ওটা শীত[illegible]।

আবহবিদ্যামন্দিরের ডক্টর এস. এন. সেন ও তাঁর গৃহিণী আমাদের ঠাঁই দিলেন। "কত অজানারে জানাইলে তুমি," কবি যথার্থ বলেছেন, "কত ঘরে দিলে ঠাঁই!" দিন তিনেক পরে যখন বিদায় নেবার

সময় এলো তখন সত্য হলো তার পরের পংক্তিটি—"দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু, পরকে করিলে ভাই।"

এই সেই পুণ্য নগরী যার সকাশে ভেট আসত দিল্লী থেকেও। দিল্লী থেকে, গুজরাট থেকে, উৎকল থেকে, তাঞ্জোর থেকে। এত বিশাল ছিল মহারাষ্ট্র সীমান্ত! সেই নগরী এখন প্রদেশের রাজধানীও নয়। তার প্রধান আকর্ষণ তার ঘোড়দৌড়, প্রধান পরিচয় তার স্কন্ধাবার। বম্বের কুবেরকুল সেখানে বাগানবাড়ী করেছেন, শহরে অতিষ্ঠ বোধ করলে বাগানবাড়ীতে ছুটি কাটাতে আসেন। তাতে মোটরিং-এর ফূর্তিও হয়। আর হয় নিচু দরের দার্জিলিং-এর শীতভোগ।

এখনো বহু দেশীয় রাজ্য মরাঠাদের অধিকারে। গোয়ালিয়র, ইন্দোর, বড়োদা, কোল্হাপুর ইত্যাদি জুড়লে মহারাষ্ট্রের সীমান্ত সুদূর-প্রসারী। মরাঠাদের মনের উপর এর প্রভাব কোনো দিন নিষ্প্রভ হয়নি। বাংলার বাইরে লক্ষ লক্ষ বাঙালী সসম্মানে বাস করছে বলে বাঙালীর পক্ষে প্রাদেশিক হওয়া শক্ত। চার দিক থেকে বিতাড়িত হওয়ায় প্রাদেশিকতার সূচনা দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু দশ দিকে ছড়িয়ে যাওয়াও সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। তেমনি মরাঠাদের পক্ষে প্রাদেশিক হওয়া দুষ্কর। তাদের মধ্যে বরং একটু সাম্রাজ্যবাদের অভিমান আছে। কী করা যায়, মরাঠা সাম্রাজ্য তো ফিরবে না। তার বদলে যদি হিন্দু সাম্রাজ্য হয় তা হলে মন্দ হয় না। "হিন্দুডম" এই অপরূপ শব্দটি মহারাষ্ট্রীয় মস্তিষ্কের অপূর্ব উদ্‌ভাবন। আপাতত পুনা শহরটাই "হিন্দুডম"-এর প্রেসিডেণ্টধানী।

সেদিন অল্‌তেকরকেও পুনায় পাওয়া গেল। তিনি আমাকে প্রথমে নিয়ে গেলেন ফারগুসন কলেজ দেখাতে। এটি মারাঠাদের অতুল কীর্তি। গোখলের ত্যাগ ভারতবিদিত, কিন্তু ত্যাগ আরো অনেকের। কলেজ তখন বন্ধ ছিল। খোলা ছিল লাইব্রেরি। লাইব্রেরিতে

বসে পড়াশোনা করার জন্যে বিস্তীর্ণ ব্যবস্থা করা হয়েছে, যার নিজের বই নেই তার বইয়ের ভাবনা নেই। কলেজটির অবস্থান, তার নির্মাণসৌষ্ঠব, তার বিদ্যার্থীভবন, সবই উন্নত ধরণের। পরের দিন আলাপ হলো মহাজনীর সঙ্গে। ইনি কলেজের অধ্যক্ষ। বয়স অল্প, মনীষা অসাধারণ। কেবল পড়ার গুরু নন, খেলার সাথী ও সেনানায়ক। এত বড় কলেজের অধ্যক্ষ, কিন্তু থাকেন একটি নগণ্য বাংলোয়। গোখলের মতো মহাজনেরা যে পথে গেছেন মহাজনী সেই পন্থা অনুসরণ করে স্বচ্ছন্দে না থাকুন স্বস্তিতে আছেন।

এর পরে সার্ভেন্টস অফ ইণ্ডিয়া সোসাইটিতে গিয়ে কোদণ্ডরাওকে একটা চমক দেওয়া গেল। নিজেও পেলুম একটা চমক। এঁরা কত অল্পের মধ্যে ঘরসংসার চালান। সমস্ত ক্ষণ যেন তাঁবুতে। কখন কোন্‌খান থেকে ডাক আসবে, অমনি সুটকেশ হাতে নিয়ে দু'এক হাজার মাইল রেলদৌড়। নিজের বলতে এঁরা বেশী কিছু রাখেননি। তবে একেবারে ফকির নন। গোখলে যে কেমন করে গান্ধীর আচার্য হলেন তার সাক্ষী এই ভারতসেবক সমিতি। এর রাজনীতি যাই হোক না কেন, এর কর্মনীতির তুলনা নেই। বিভিন্ন প্রদেশের নিঃস্বার্থ কর্মী ও বিদ্বানদের নিষ্ঠাপর জনসেবা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, দশকের পর দশক পরিচালিত হচ্ছে এই কেন্দ্র থেকে। এঁদের কার্যতালিকা বৈচিত্র্যময়। কোল ভীল অস্পৃশ্যদের মধ্যেও কাজ হচ্ছে, আবার মিল শ্রমিকদের মধ্যেও। বিদেশে এ দেশের শ্রমিকরা কী ভাবে থাকে তদন্ত করার জন্যে মাঝে মাঝে এঁরা প্রতিনিধি পাঠান। কোদণ্ডরাওয়ের মুখে শোনা গেল ফরাসী ইন্দোচীনে তাঁর প্রবেশ-নিষেধের কাহিনী।

ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণের ব্যবধান ইদানীং ধামাচাপা পড়েছে বটে, কিন্তু তার সত্তা এখনো রয়েছে। নেই যাঁরা ভাবেন তাঁরা কখনো বাঁকুড়া

জেলায় বাস করেননি, মহারাষ্ট্রে প্রবাস করেননি, উৎকলে মানুষ হননি, দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণ করেননি। অলতেকর বললেন আমি যদি তাঁর প্রদেশকে সব দিক থেকে চিনতে চাই তবে যেন অব্রাহ্মণদের সঙ্গেও মিশি। তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন অধ্যাপক থাড্‌য়ের আবাসে।

থাড্‌য়ে সুধী ও সুপুরুষ। তাঁর সঙ্গে যা নিয়ে আলোচনা তার কিছুই স্মরণ নেই। শুধু মনে আছে পুনার মিউনিসিপাল পলিটিক্সে ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ ভেদ বিদ্যমান। তা বলে সেটা মারাত্মক নয়, অব্রাহ্মণ দলে ব্রাহ্মণও জোটে, ব্রাহ্মণ দলে অব্রাহ্মণও। সাম্প্রদায়িকতার মতো জাতিভেদও দেখছি হনুমান ও বিভীষণের মতো অমর। রাবণরূপী সাম্রাজ্যবাদ যদি বা মরে এই দুটি আয়ুষ্মান যুগোচিত মুখোশ পরে লাফালাফি দাপাদাপি করতে থাকবে, যতদিন না অসবর্ণ ও অসাম্প্রদায়িক বিবাহ দেশব্যাপী হয়।

পরের দিন মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে গেলুম। মহারাষ্ট্রের আরেকটি অনুপম কীর্তি। কার্ভের দর্শন পাওয়া গেল। সাদাসিধে নিরীহ মানুষটিকে দেখে দিনমজুর ভেবে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলুম। অলতেকর বললেন, ইনিই কার্ভে। অশীতিপর বৃদ্ধ, সেকালের মহাস্থবির। একদা এঁরাই ভারতের সঙ্ঘপতি ছিলেন, কখনো মিলিত হতেন পাটলীপুত্রে, কখনো পুরুষপুরে, কখনো নালন্দায়, কখনো বিক্রমশিলায়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে মনে পড়ে যায়। কিন্তু কার্ভের কাজ মহিলাদের নিয়ে। তাঁর আবার ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা মাতৃজাতির শিক্ষার বাহন হবে মাতৃভাষা। মরাঠির মতো একটি প্রাদেশিক ভাষায় ক'খানাই বা কেতাব আছে যা পড়ে ইতিহাসে দর্শনে গণিতে বা রসায়নে গ্রাজুয়েট হওয়া যায়। তবু কার্ভের দুঃসাহসে তাও সম্ভব হয়েছে, পরে এক গুজরাতী কুবেরজায়ার দানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ হয়েছে, গুজরাতী মেয়েদের জন্যে শিক্ষার বাহন হয়েছে গুজরাতী। তাদের সুবিধার

জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ বিভাগ স্থানান্তারিত হয়েছে বম্বেতে। পুনায় যেটুকু অবশিষ্ট সেটুকু দেখে সম্যক ধারণা হলো না।

এর পরে হিন্দু বিধবাভবন। এটিও পুনার তথা মহারাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য। বিধবারা এখানে লেখাপড়া ও কাজকর্ম শিখে গ্রামে গ্রামে শিক্ষাবিস্তার করেন। শহরের বাইরে অবস্থান, স্বাস্থ্যকর আবেষ্টন। ফারগুসন কলেজ ও সার্ভেন্টস অফ ইণ্ডিয়া সোসাইটির মতো এই প্রতিষ্ঠানটিরও কয়েকজন স্থায়ী কর্মী আছেন। অন্যূন বিশবছর কর্ম করবেন এই অঙ্গীকার দিতে হয়, বিশ বছর পরে নিষ্কৃতি। পরিচালনার ভার পনেরোজন নিষ্ঠাপর স্থায়ী কর্মীর হাতে। এঁদের মধ্যে কার্ভে তো আছেনই, আছেন আটজন বিদুষী মহিলা, প্রায় সকলেই কার্ভের প্রাক্তন ছাত্রী। এই প্রতিষ্ঠানটির অধীনে কয়েকটি শাখা প্রতিষ্ঠান বা পাঠশালা আছে বিভিন্ন জেলায়।

মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনা কলেজের অধ্যক্ষ কমলাবাই দেশপাণ্ডে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও সংবাদিক কেলকর মহাশয়ের কন্যা। ইউরোপের প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর। তার আগে নিজেদের মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট। ইনি বিধবাভবনেরও একজন স্থায়ী কর্মী। দুঃখের বিষয় অল্প বয়সেই বিধবা। সেকালের তপস্বিনীদের সম্বন্ধে আমাদের কল্পনায় একটি চিত্র আছে, কমলাবাইকে সেই ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে মিলে যায়। তা বলে তিনি বল্কল কিম্বা চীবর পরিধান করেন না, অনাহারে কঙ্কালসার নন। প্রভূত প্রাণশক্তির অধিকারিণী, সেই সঙ্গে মনস্বিতার। "প্রাচীন ভারতে শিশু" নামে একটি সন্দর্ভ লিখেছেন বিদেশী ভাষায়।

লোকমান্য টিলকের কর্মপন্থার উত্তরাধিকারীরূপে কেলকরের পরিচয় আমার অগোচর ছিল না। কিন্তু মরাঠাদের সেই লাল রঙের শিরস্ত্রাণ দেখলেই আমার শিরঃপীড়া জন্মায়। বাঁচা গেল সন্ধ্যাবেলা কেলকরকে নাঙ্গা শির দেখে! আদৌ ভীষণ নন, বেশ

সহজ মানুষ, তবে রাশভারি। বাংলাদেশ সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখেন, যৌবনে যেন কিছু বাংলা শিখেছিলেন, মনে পড়ছে। বড় বড় মরাঠী বই লিখেছেন, একখানা দেখালেন। গম্ভীর বিষয়ের পুঁথি মরাঠারা কেনে। মরাঠারা সংখ্যায় বাঙালীর চার ভাগের এক ভাগ। কিন্তু তাদের রাজারাজড়ারা শুধু সংখ্যায় নয়, দাক্ষিণ্যে অগ্রগণ্য।

(১৯৪২-৪৩)

গান্ধীজী

মহাভারতের নায়ক কে? ভীম নন, অর্জুন নন, এমন কি ভগবানের অবতার যে কৃষ্ণ তিনিও নন। মহাভারতের নায়ক যুধিষ্ঠির। ব্যাসদেব তাঁকে ভারতের সিংহাসনে বসিয়ে ক্ষান্ত হলেন না, ভাবলেন ভারতের সিংহাসনে তো কত লোক বসেছে, যুধিষ্ঠিরকে দিতে হবে আরো বড় সম্মান, যে সম্মান আর কোনো মানুষ কোনো কালে পাননি। যুধিষ্ঠিরকে তিনি নিয়ে চললেন হিমালয়ের শিখরের পর শিখর অতিক্রম করিয়ে এমন এক দুর্গম স্থলে যার নাম স্বর্গ, যেখানে কেউ কোনো দিন সশরীরে যায়নি। সেকালে যাঁরা অমর হবার বর পেয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন মর্তে অমর, ব্যাসদেব ইচ্ছা করলে যুধিষ্ঠিরকে তাঁদের মতো অমর করতে পারতেন, কিন্তু তাঁরা তো কেউ সশরীরে স্বর্গপ্রবেশ করেননি, সে সম্মান একমাত্র যুধিষ্ঠিরের প্রাপ্য। কারণ যুধিষ্ঠির ছিলেন সত্যবাদী।

আজকাল আমরা সাম্রাজ্যবাদ সাম্যবাদ প্রভৃতি কত রকমের বাদ নিয়ে বিবাদ করছি, কিন্তু ব্যাসদেব যদি থাকতেন তিনি বলতেন সবচেয়ে বড় বাদ সত্যবাদ। সবচেয়ে বড় বাদী সত্যবাদী। ব্যাসদেব যদি বিংশ শতাব্দীর মহাভারত লিখতেন তো তার নায়ক করতেন এ যুগের যুধিষ্ঠিরকে। গান্ধীজীকে। যে পুরস্কার কখনো কোনো মানুষ জীবিতকালে পায়নি তেমন কোনো সম্মান কল্পনা করতেন তাঁর জন্যে। সত্যবাদীর জন্যে।

সত্যকে ভারতের লোক সবচেয়ে উচ্চ আসন দিয়ে এসেছে, নতুবা মহাভারতের নায়ক হতেন কৃষ্ণ কিংবা অর্জুন। ভবিষ্যতে

যখন মহাকাব্য রচিত হবে তখন ভারতের মহাকবি সত্যকেই শীর্ষ-স্থান দেবেন, নায়ক করবেন গান্ধীজীকে। সত্যের সঙ্গে সমান ওজন অহিংসার। অহিংসাকে ভারতের লোক পরম ধর্ম বলে গণ্য করে এসেছে। অজন্তার গুহাচিত্রে পরম ধার্মিক বুদ্ধদেবের মূর্তি আর সকলের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে। তাঁর পাশে আর সকলে যেন বামন। ভবিষ্যতে ভারতের চিত্রকর গান্ধীজীকে তেমনি করে আঁকবেন অহিংসার মাহাত্ম্য পরিস্ফুট করতে। হাজার হাজার বছর পরে যারা দেখবে তারা অহিংসার মহত্ত্ব উপলব্ধি করবে। যুধিষ্ঠির আর বুদ্ধ উভয়ের উত্তরাধিকারী গান্ধীজী ভারতের দুটি সনাতন প্রবাহের যুক্তবেণী।

(১৯৪৬)

গান্ধীজীর লক্ষ্য

সব দেশেই একদল লোক কর্তৃত্ব করে, আরেক দল করে সমালোচনা। কর্তারা যদি সমালোচকদের সঙ্গে বনিয়ে চলে তো গোলমাল বাধে না। কিন্তু অনেক সময় উভয় দলের পেছনে থাকে বিপরীত স্বার্থ। স্বার্থের সঙ্গে স্বার্থের বনিবনা অত সহজ নয়। সেইজন্যে সমালোচকরা ধীরে ধীরে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। উভয় পক্ষই বাহুবলের আশ্রয় নেয়। যে পক্ষ জেতে সে পক্ষ কর্তা হয়। বিদ্রোহীরা কর্তা হলে অপর পক্ষ করে সমালোচনা, এবং সুযোগ বুঝে পাল্টা বিদ্রোহ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিদেশীরা উভয় পক্ষে বা এক পক্ষে যোগ দেয়। ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে ওঠে। ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ অঙ্কে বিদ্রোহের রূপ হয় বৈপ্লবিক। পাল্টা বিদ্রোহের রূপ হয় প্রতিবৈপ্লবিক। বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব বৈদেশিক হস্তক্ষেপের ফলে জটিল আকার ধরে। ক্রমশ পরিণত হয় গৃহযুদ্ধে, পরিশেষে আন্তর্জাতিক যুদ্ধে। আমাদেরই জীবনকালে এরকম ঘটতে দেখা গেল রুশদেশে। রুশদেশের প্রতিবিপ্লবীরা সব দেশে ছড়িয়ে পড়েছে, সব দেশ বিপ্লবের ভয়ে প্রতিবিপ্লবীদের পক্ষ নিয়ে আরেক বার ঝাঁপিয়ে পড়বে। আন্তর্জাতিক যুদ্ধে প্রতিবিপ্লব ফ্রান্সের বেলা সফল হয়েছিল, রাশিয়ার বেলা যদি সফল হয় তো বিপ্লব শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হবে। বিপ্লব যাতে ব্যর্থ না হয় তার জন্যে একশো বছর আগে থেকে চিন্তা করে গেছেন মার্ক্‌স্‌। ফরাসী বিপ্লব কেন ব্যর্থ হলো তা নিয়ে তাঁকে অনেক ভাবতে হয়েছিল। ভেবেচিন্তে তিনি এই রায় করলেন যে বিপ্লবের পরে প্রতিবিপ্লব অবশ্যম্ভাবী, প্রতিবিপ্লবের জন্যে প্রস্তুত হয়ে বিপ্লবে নামতে হবে, যারা প্রতিবিপ্লবের জন্যে অপ্রস্তুত হ'য়ে বিপ্লবে

নামে তারা আখেরে পরাজিত হয়। মার্ক্স্ তাঁর শিষ্যদের মন্ত্র দেন দুই ভাবে প্রস্তুত হতে। তিনি স্বয়ং একখানি শাস্ত্র রচনা করলেন, সে শাস্ত্র বেদের মতো অভ্রান্ত। একদল ব্রাহ্মণও সৃষ্টি করলেন, এঁরা কমিউনিস্ট। এঁদের যজমান হচ্ছে কারখানার মজদুর শ্রেণী। যজমানদের সংঘবদ্ধ করা ও বেদ ব্রাহ্মণে বিশ্বাসবান করা হলো প্রথম কাজ। ইতিহাসের সঙ্কটক্ষণে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আত্মসাৎ করা হলো দ্বিতীয় কাজ। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বলতে বোঝায় পুলিশ ও মিলিটারি। পুলিশ ও মিলিটারি হাতে এলে আর সব আপনি আসে। কারখানার সংখ্যা বাড়িয়ে মজদুর সংখ্যা বহুগুণ বাড়ানো যায়। রুশদেশে এখন কোটি কোটি মজদুর, কোটি কোটি সৈনিক। এদের সংঘবদ্ধ করছে কমিউনিস্ট পার্টি। কমিউনিস্ট পার্টিকে ঠিক রেখেছে কার্ল মার্ক্সের শাস্ত্র, লেনিনের ভাষ্য, স্টালিনের টীকা। সব অভ্রান্ত। দুনিয়ার সব দেশেই এখন এঁদের অনুচর আছে। সব দেশের কারখানার মজদুর এঁদের পক্ষপাতী। ভাবী যুদ্ধে যেসব দেশ রাশিয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে সেসব দেশের মজদুর অশান্ত হবে। ভাবী যুদ্ধে রাশিয়াকে হারানো জার্মানী বা জাপানকে হারানোর মতো সহজ হবে না। রুশ বিপ্লব ফরাসী বিপ্লবের মতো নাটকীয় ঘটনা নয়। এর পেছনে একশো বছর ধরে প্ল্যান করে প্রস্তুত হওয়া চলেছে। তা সত্ত্বেও যদি রাশিয়া হারে তো বুঝতে হবে পরমাণুশক্তির কাছে হেরে গেছে। পরম হিংসার কাছে হেরে গেছে।

গান্ধীর মাহাত্ম্য এইখানে যে পরমাণুশক্তি তাঁকে হারাতে পারবে না, পরম হিংসা তাঁকে হারাতে পারবে না। পৃথিবীতে হয়তো আণবিক বোমার চেয়েও মারাত্মক অস্ত্র উদ্ভাবিত হবে, কিন্তু যত মারাত্মক হোক না কেন কোনো অস্ত্রই তাঁকে পরাস্ত করতে পারবে না। তাঁকে হারাতে পারত তাঁর নিজেরই কাম ক্রোধ লোভ, কিন্তু এসব রিপুকে

তিনি জয় করেছেন, জয় করেছেন যাবতীয় দুর্বলতা, স্বার্থচিন্তা, অন্যায়চিন্তা। তাঁর নিজের বলে কিছু নেই, সুতরাং ভয় বলে কিছু নেই। সমগ্র দেশ যখন ভয়ে আড়ষ্ট তিনি তখন অকুতোভয়। তিনি যেমন অন্যায় করবেন না, তেমনি অন্যায় সইবেন না। এই অসহিষ্ণুতা থেকে এসেছে অসহযোগ। অসহযোগকে অহিংস করেছে তাঁর মানবপ্রেম। অসহযোগ ও অহিংসা দুটোই কেমন নেতিবাচক শোনায় বলে রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভ ছিল, ক্ষোভ ছিল আমারও। কিন্তু এ দুটি নেতিবাচক শব্দের মূলে কাজ করছে ইতিবাচক প্রেরণা, সত্যাগ্রহ। গান্ধীজী সত্যের আগ্রহে অসহিষ্ণু হয়ে অসহযোগী হয়েছেন, অহিংস রয়েছেন সত্যের আগ্রহে। একটি সত্য ন্যায়বোধ, আরেকটি সত্য মানবপ্রেম। এই যুগ্ম সত্যকে এক কথায় বলা যেতে পারে সকলের মধ্যে আপনাকে দেখা, আপনার মধ্যে সকলকে দেখা, অভেদ জ্ঞান। এমন মানুষের কোনো শত্রু থাকতে পারে না, দৃশ্যত যে শত্রু সেও তাঁর আপনার লোক। একদিন তিনি তাকে প্রেমের দ্বারা জয় করবেনই। যীশু যেমন শত্রুকে মিত্রের মতো ভালোবাসতে বলেছেন গান্ধীও তেমনি বলছেন। দু' হাজার বছর পরে এই একজনকে দেখা গেল যিনি যীশুর মতো শত্রুপ্রেমিক, যুধিষ্ঠিরের মতো সত্যবাদী, উপনিষদের ঋষিদের মতো সকলের মধ্যে আত্মদর্শী, আত্মার মধ্যে সর্বদর্শী। জগতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা তাঁর জীবনের অঙ্গীভূত হয়েছে।

গান্ধীজীর সত্যের পরীক্ষা কেবল রাজনীতিক্ষেত্রে নিবদ্ধ নয়, জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রসারিত। কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রেই সে পরীক্ষা সব চেয়ে তাৎপর্যবান। রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা ও অবিবেচনা থেকে আসে বিদ্রোহ ও পাল্টা বিদ্রোহ, বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব, গৃহযুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক যুদ্ধ। যত অশান্তির উৎপত্তি হয় রাজনৈতিক আস্তাকুঁড়ে।

সুতরাং রাজনৈতিক আস্তাকুঁড় সাফ করাও মহাধার্মিকের কাজ। এ কাজ করতে গিয়েই যীশুর প্রাণ গেল, মহম্মদের প্রাণ যেতে বসেছিল। কিন্তু এ কাজ করবার যোগ্যতা সব মহাপুরুষের নেই। অনধিকারচর্চা করতে গিয়ে বহু মহাপুরুষ অপদস্থ হয়েছেন। গান্ধীজীর রাজনৈতিক যোগ্যতা সম্বন্ধে আজ কারো সন্দেহ নেই, একদিন সন্দেহ ছিল। রাজনৈতিক সঙ্কটমুহূর্তে তিনি যেভাবে পলিসি নির্দেশ করেছেন কোনো পেশাদার রাজনীতিবিদ্‌ও তেমনটি পারতেন না। তিনি যদি কেবলমাত্র পলিটিসিয়ানও হতেন, তা হলেও নিছক পলিসির বিচারে অগ্রগণ্য হতেন। জাতীয় সংগ্রামের সেনাপতি হিসাবেও যদি তাঁকে বিচার করা হয় তা হলেও দেখা যাবে তাঁর পরিচালনা নির্ভুল।

ইতিহাস তাঁকে প্রধানত বিচার করবে পরমাণুশক্তির চেয়ে আরো বড় শক্তির আবিষ্কারক তথা প্রযোগকর্তা রূপে। এমন এক শক্তির সন্ধান তিনি পেয়েছেন যার পাল্টা নেই, সুতরাং পাল্টা বিদ্রোহ এ দেশে ঘটবে না, প্রতিবিপ্লবের পথ বন্ধ। বিপ্লবী ফ্রান্স শেষ পর্যন্ত ওয়াটারলুতে হেরে গেল, বিপ্লবী রাশিয়া যদিও স্টালিনগ্রাডে জিতে গেল তবু শেষ পর্যন্ত আণবিক যুদ্ধে জয়ী হয় কিনা অনিশ্চিত। কিন্তু গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে অনায়াসেই ভবিষ্যদ্‌বাণী করা যায় যে যতই বিলম্ব হবে ততই কার্যসিদ্ধি হবে। কারণ তাঁর লক্ষ্য হচ্ছে প্রতিপক্ষের অন্তঃপরিবর্তন। অন্তঃপরিবর্তনের লক্ষণ আমরা দিকে দিকে প্রত্যক্ষ করছি। কিন্তু এখনো দিনের আলোর মত প্রত্যক্ষ নয়। এমন কি, ভোরের আলোর মতো পরিস্ফুটও নয়। কিন্তু রাত শেষ হয়ে আসছে। কেউ জোর করে বলতে পারবে না আরো ক'বছর লাগবে অন্তঃপরিবর্তন জাজ্বল্যমান হতে। আরো ক'বার সত্যাগ্রহ করতে হবে। এ তো বারো ঘণ্টার রাত নয়, দু'শো বছরের রাত। দু'শো বছরের বেশীও বলতে পারি, কেননা গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ কেবল ব্রিটিশ

রাজের বিরুদ্ধে নয়, স্বদেশী স্বার্থপরদের বিরুদ্ধেও। স্বদেশী স্বার্থান্বেষীরা হাজার বছর আগেও ছিল। দেশের সাধারণ লোক হাজার হাজার বছর ধরে সুদ মুনাফা ও খাজনা জুগিয়ে আসছে, তাদের রক্তে পুষ্ট হয়ে আসছে উপরের দিকের উপস্বত্বভুক্ শ্রেণী। গান্ধীজী যদি এই শ্রেণীটির রাজত্বকে স্বরাজ বলে ভুল করতেন তা হলে খদ্দরের বদলে মিলের কাপড়ের গুণগান করতেন। ইংরেজ চলে গেলে এই শ্রেণীর স্বরাজ হবে, এটা তিনি চান না বলেই তো গঠনের কাজ করতে সবাইকে বলেছেন। গঠনের কাজ এমন ভাবে কল্পিত হয়েছে যে সমগ্র দেশ যদি গঠনের কাজ করে তো কলকারখানা আপনি বন্ধ হয়ে যাবে, শহরে বেশী লোক থাকবে না, উপস্বত্বভুক্‌দের সঙ্গে সংগ্রাম করার আগেই তারা সন্ধি করবে। ভূমি রাষ্ট্রের বকলমে প্রজার হবে, উৎপাদনের সাজসরঞ্জাম উৎপাদকের হবে, উপস্বত্বভোজীরা প্রথম দিকে ট্রাস্টী হবে, অবশেষে উৎপাদক হবে।

টলস্টয়, থোরো ও রাস্‌কিন গান্ধীজীর গুরু। গান্ধীবাদের বারো আনাই এই তিনজনের মতবাদ। এঁরা না হলে গান্ধীজীও হতেন না। গান্ধীজীকে বিশুদ্ধ ভারতীয় সাধক বলে ভাবা ভুল। তিনি একটি বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক সাধনার ভারতীয় সাধক। কোয়েকাররাও সে সাধনায় তাঁর পূর্বগামী। ইংলণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর যৌবন কেটেছে। সেই সূত্রে তাঁর মতবাদ গড়ে উঠেছে। খাঁটি ভারতীয়রা তাঁকে কোনোদিন বুঝবে না।

(১৯৪৬)

গান্ধীজীর পরীক্ষা

এক যে ছিল খোঁড়া রাক্ষস। তার এক বন্ধু ছিল, কাণা রাক্ষস। খোঁড়া এমন খোঁড়া যে এক পাও হাঁটতে পারে না। আর কাণা যদিও হাঁটতে পারে তবু হাঁটতে গেলেই খানায় পড়ে। তখন তারা দুই বন্ধুতে মিলে যুক্তি করলে যে খোঁড়া চাপবে কাণার কাঁধে, আর কাণা হাঁটবে খোঁড়ার হুঁশিয়ারি শুনে। তখন থেকে খোঁড়া বনল কাণার সওয়ার, কাণা বনল খোঁড়ার ঘোড়া।

ওদিকে কিন্তু দুই রাক্ষসের দুরন্তপনায় মানুষের পক্ষে টেঁকা দায়। মানুষের বংশ ধ্বংস হতে চলল। সেই দুর্দিনে মানুষের ঘরে দুই মহাপুরুষ আবির্ভূত হন। একজনের নাম লেনিন। একজনের নাম গান্ধী।

লেনিনের দৃষ্টি সওয়ারের ওপর, গান্ধীর দৃষ্টি ঘোড়ার ওপর। লেনিন বলেন, সওয়ারটাকে সরাও, তাহলেই ঘোড়াটা খাদে পড়ে ঘোটকলীলা সংবরণ করবে। গান্ধী বলেন, ঘোড়াটাকে আটকাও, তাহলে সওয়ারটাও আটকা পড়বে। লেনিন বলেন, আমি চললাম রুশদেশে। সে দেশে আমার সওয়ার সরানোর পরীক্ষা চালাব। গান্ধী বলেন, আমি চললুম ভারতবর্ষে। সে দেশে আমার ঘোড়া আটকানোর পরীক্ষা চালাব।

তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ ঘোড়াটার নাম মিলিটারিজম্ বা সংঘবদ্ধ হিংসা। আর সওয়ারটার নাম ক্যাপিটালিজম্ বা সংঘবদ্ধ শোষণ। শোষণের মহাশত্রু লেনিন আর হিংসার মহাশত্রু গান্ধী।

এর থেকে তোমাদের হয়তো মনে হবে গান্ধী বুঝি শোষণের মিত্র, লেনিন বুঝি হিংসার মিত্র। সেটা তোমাদের ভ্রম। লেনিন বার বার বলেছেন তিনি হিংসা ভালোবাসেন না, হিংসায় সায় দিচ্ছেন বাধ্য হয়ে।

গান্ধীও বার বার বলেছেন তিনি শোষণ ভালোবাসেন না, শোষণ সহ্য করছেন বাধ্য হয়ে। আসলে হয়েছে কী, তাঁদের দু'জনের দু'দিকে দৃষ্টি, কিন্তু উদ্দেশ্য একই। উদ্দেশ্য হচ্ছে এক রাক্ষসের থেকে আরেক রাক্ষসকে পৃথক করে দুটোকেই দুর্বল করা, পরাজিত করা। কাণা সরে গেলে খোঁড়া একেবারে পঙ্গু। খোঁড়া সরে গেলে কাণা একেবারে অকেজো। তখন তাদের হারিয়ে দেওয়া সোজা।

দুই পরীক্ষার জন্যে দুই স্বতন্ত্র দেশ বরাদ্দ করেছে ইতিহাস। একই যুগে দুই স্বতন্ত্র পরীক্ষা চলছে। অন্যান্য দেশের লোক চেয়ে দেখছে। যে পরীক্ষা মানুষকে সব চেয়ে কম দুঃখ দেবে, মানুষের সব চেয়ে বেশী দুঃখমোচন করবে, সেই পরীক্ষা অন্যান্য দেশের লোক মেনে নেবে। লেনিনের পরীক্ষা এখনো শেষ হয়নি, লেনিনের শিষ্য স্টালিন এখন লেনিনের ল্যাবরেটারীতে কাজ করছেন। আর গান্ধীজীর পরীক্ষারও আরো পঞ্চাশ বছর বাকী, তাই তিনি নিজেই আরো পঞ্চাশ বছর বাঁচতে চান। তাঁর ল্যাবরেটারিতে কাজ শিখছেন বিনোবা ভাবে, কৃষ্ণদাস যাজু, সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রভৃতি তরুণ ছাত্ররা।

গান্ধীজী কী চান? গান্ধীজী চান মিলিটারিজম্ বা সংঘবদ্ধ হিংসা ভারতের কনিষ্ঠতম শিশুর কাছে ফণা নত করুক। আত্মিক বল দৈহিক বলের ওপর জয়ী হোক। পরমাত্মশক্তি পরমাণুশক্তিকে নিষ্ফল ও নিষ্প্রভ করুক। এক দিকে এক বিরাট সাম্রাজ্য ও তার ভীষণ মারণাস্ত্র। অন্য দিকে শিশুর মতো সরল, শিশুর মতো নিরীহ, নিষ্পাপ, নিঃসম্বল একটি বৃদ্ধ। যাঁর দেহ বলতে বিশেষ কিছু নেই, আত্মাই সব। এই অসম সমরে চূড়ান্ত বিজয় কোন পক্ষের কে জানে!

হিংসা যদি অহিংসার কাছে হার মানে শোষণের বিষ দাঁত ভেঙে যাবে। রণতন্ত্রের অবসান ঘটলে ধনতন্ত্রের অবসান ঘটবে। মানুষকে শোষণ করে মানুষ বড়মানুষ হবে না। বড়মানুষীর দিন যাবে। তখন

ছোট বড় সকলেই হবে সত্যিকারের বড় মানুষ। যে মানুষ রাক্ষস নয়, পরস্বভোজী নয়, যে মানুষ আত্মশ্রমের ফলভোক্তা। চরকা হচ্ছে আত্মশ্রমের ফলভোজের প্রতীক। চরকার অর্থ যে যার উৎপন্ন দ্রব্য ভোগ করবে, যে যার ভোগসামগ্রী উৎপাদন করবে। অবশ্য সদলবলে উৎপাদন ও উপভোগ করতে আপত্তি নেই, যদি নিজেদের মধ্যে ভাগ নিয়ে বোঝাপড়া হয়। যেমন একান্নবর্তী পরিবারে। একান্নবর্তী পরিবারের মতো একান্নবর্তী গ্রাম, একান্নবর্তী শহর, একান্নবর্তী প্রদেশ, একান্নবর্ত্তী দেশ, এমন কি একান্নবর্ত্তী বিশ্ব, সবই সম্ভবপর। নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হলে বড় বড় কলকারখানাও আপোষে চলবে। কিন্তু আসল কথা হলো যে যার আত্মশ্রমের ফলভোক্তা হবে, পরশ্রমের ফলভোজী বলতে কেউ থাকবে না। আর অহিংস হবে প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতি। সংঘবদ্ধ হিংসার কথা কেউ কল্পনাও করবে না। আর ব্যক্তির ওপর সমাজ বা রাষ্ট্র জুলুম করবে না। কেউ যদি সমাজের বা রাষ্ট্রের বাইরে থেকে চরকা কেটে জীবিকা অর্জন করতে যায় তো সে স্বাধীন।

(১৯৪৭)

আমাদের স্বাধীনতা

বিষ্টু বলছিল তার বন্ধুদের।

ইংরেজ সহজে মনঃস্থির করে না, কিন্তু একবার মনঃস্থির করলে সহজে নড়চড় করে না। এইখানে ওদের বৈশিষ্ট্য। ভারতবর্ষ থেকে অপসরণের প্রস্তাবে একদা ওরা নারমুখো হয়েছে, কারণ তখনো ওদের ধারণা ছিল ওদের ভারতীয় সিপাহীরা পরম রাজভক্ত। কিন্তু যেদিন প্রত্যক্ষ করল ভারতীয় নৌসেনা বিদ্রোহী হয়েছে সেই দিন ওদের প্রত্যয় জন্মাল যে আর দেরি করলে স্থলসৈন্যেরাও বিদ্রোহী হবে। সেই দিনই ওরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল ভারত থেকে অপসরণের।

অপসরণের ঐ মূল সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর প্রশ্ন উঠল, ভারতের ভার কার হাতে অর্পণ করে অপসরণ করবে? কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাবে? চিরশত্রু কংগ্রেসকে? চিরমিত্র লীগকে? বহু কালের ব্রিটিশ পলিসি, ভারতবর্ষে ওরা কোনো একটা শক্তিকে একচ্ছত্র হতে দেবে না। ইউরোপেও ওদের ঐ একই পলিসি। এবং ঐ পলিসি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে গিয়ে এক কালে স্পেনের সঙ্গে যুদ্ধ, পরবর্তী কালে ফ্রান্সের সঙ্গে সমর, এবং বর্তমান শতাব্দীতে জার্মানীর সঙ্গে সংঘাত। আজ না হয় ইংলণ্ড দুর্বল হয়ে পড়েছে, কিন্তু কূটনীতিতে এখনো তেমনি পরিপক্ক।—ভারতবর্ষে সে কখনো কংগ্রেসকে একচ্ছত্র হতে দেবে না। সুতরাং স্থির করল কংগ্রেস ও লীগ উভয়ের মিলিত হস্তে ক্ষমতা সম্প্রদান করবে। ইন্টেরিম গভর্ণমেণ্ট গড়তে কংগ্রেসনেতাদের আমন্ত্রণ করল এবং সামনের দরজা দিয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা করে' খিড়কির দরজা দিয়ে ডেকে আনল লীগনেতাদের—

যাতে কংগ্রেসের সঙ্গে লীগের হাতাহাতি বাধে ও তার ফলে কংগ্রেসের শক্তি খর্ব হয়।

হলোও তাই। কেবল যে গভর্ণমেণ্টের ভিতরে হলো তাই নয়, সারা দেশ জুড়ে শহরে গ্রামে পথে ঘাটে আবালবৃদ্ধবনিতার জীবনে হলো। লুটতরাজ খুনজখম নারীধর্ষণ শিশুমেধ ভারতবর্ষে মধ্যযুগ ফিরিয়ে আনল। শক্তির অপচয় দেখে কংগ্রেস তার মনঃস্থির করে ফেলল। যে সব অঞ্চলে কংগ্রেস দুর্বল লীগ প্রবল সে সব অঞ্চল লীগকে ছেড়ে দিয়ে অবশিষ্ট ভারতে লীগবিবর্জিত গবর্ণমেণ্ট গঠনের সংকল্প নিল। ইংরেজ এতে মহা খুশি। এই তো ভালো ছেলের মতো। পাছে কংগ্রেস তার মত বদলায়, মহাত্মার পরামর্শ শোনে, সেইজন্যে রাতারাতি দেশটাকে কাঁচি দিয়ে কেটে দুখানা করে দিল। যেন সেটা মাটি নয়, কাগজ।

চার্চিল যেমন পুলকিত হলেন, গান্ধী হলেন তেমনি ব্যথিত। কিন্তু যে সিদ্ধান্ত কংগ্রেস সব দিক ভেবে গ্রহণ করেছে ও যা পালন করবে বলে বাক্য দিয়েছে গান্ধীজী তার বিরুদ্ধতা করা সমীচীন মনে করলেন না। কৈকেয়ীর কাছে দশরথ সত্য করেছিলেন, সত্যরক্ষা করতে হলো রামচন্দ্রকে। তেমনি গান্ধীজীকে।

আমাদের স্বাধীনতা বিনা সর্তে স্বাধীনতা নয়। আমাদের স্বাধীনতা সর্তাধীন স্বাধীনতা। যতবার গান্ধীজী জনগণকে সংগ্রামে আহ্বান করেছেন, যতবার বৃটিশ রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়েছেন ততবারই দাবী করেছেন বিনা সর্তে স্বাধীনতা। সর্তাধীন স্বাধীনতার প্রস্তাব তিনি বার বার প্রত্যাখ্যান করেছেন। এবারেও করতেন যদি প্রস্তাবটা তাঁর কাছে করা হতো। কিন্তু কথাবার্তা চলছিল তাঁকে দূরে রেখে ইংরেজে কংগ্রেসে। কংগ্রেস যখন তাঁকে দূরেই রাখতে চায় তখন তিনি গায়ে পড়ে হস্তক্ষেপ বা কণ্ঠক্ষেপ করবেন কেন?

নাই মামার চেয়ে কাণা মামা ভালো। স্বাধীনতাহীনতার চেয়ে সর্তাধীন স্বাধীনতা ভালো। কিন্তু এ কথা যেন এক মুহূর্তের জন্যে ভুলে না যাই যে গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতের জনগণের পঞ্চবিংশবর্ষব্যাপী সংগ্রাম সর্তাধীন স্বাধীনতার জন্যে নয়। এ স্বাধীনতার জন্যে গান্ধীজী গৌরব বোধ করেন না। এটা গান্ধীজীর জয় নয়। তা বলে তিনি তাঁর সহকর্মীদের জয়গৌরব থেকে বঞ্চিত করতে চান না। সর্তাধীনতা সত্ত্বেও এটা স্বাধীনতা তো বটেই। কেউ তো বলবে না যে, আমরা পরাধীন। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে আমরা অগ্রসর হয়েছি। তফাৎ শুধু এই যে আমরা গান্ধীজীকে মৌখিক আনুগত্য জানিয়ে মনে মনে উপেক্ষা করেছি। গান্ধীজী ও ভারতের জনগণ যেহেতু অভিন্ন সেহেতু আমরা জনগণকে উপেক্ষা করেছি। একদিন জনগণও আমাদের উপেক্ষা করবে, যদি সময় থাকতে গান্ধীজীর পরামর্শ না শুনি। মহাত্মা অবশ্য আমাদের সত্যভঙ্গ করতে বলবেন না। ভারতভঙ্গ বা বঙ্গভঙ্গের চেয়ে সত্যভঙ্গ আরো খারাপ। পাকিস্থান আমাদের শিরোধার্য করতেই হবে। এবং পাকিস্থানের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার শপথ নিতে হবে আমাদের মধ্যে যাঁদের সম্পত্তি বা যাঁদের জীবিকা পাকিস্থানে তাঁদের প্রত্যেককেই। বলা বাহুল্য তাঁরা স্বাধীনতার স্বাদ পাবেন না। পাবেন না, যতদিন না লীগের মতিগতি বদলায়। কিংবা যতদিন না মুসলমানদের লীগের প্রতি অনাস্থা জন্মায়।

আপাতত গান্ধীজীর পরামর্শ, মাইনরিটির প্রতি সমান ব্যবহার। তারা যেন বিশ্বাস করতে পারে যে রাষ্ট্র কেবল হিন্দুর বা কেবল মুসলমানের নয়। রাষ্ট্রমাত্রেই হিন্দুমুসলমান নির্বিশেষে সর্বসাধারণের। স্বাধীনতা বলতে যদি কেবল মেজরিটির স্বাধীনতা বোঝায় তবে মাইনরিটির অভিশাপ কুড়িয়ে কত দিন তা টিকবে! স্বাধীনতাকে চিরস্থায়ী করতে হলে মাইনরিটির আশীর্বাদ সঞ্চয় করতে হবে। এর

মানে এ নয় যে মাইনরিটির উপদ্রব সহ্য করতে হবে। আমরা অন্যায় করবও না, অন্যায় সইবও না। এবং আমরা প্রত্যাশা করব যে অন্যেরাও অন্যায় করবে না, অন্যায় সইবে না। মিটমাট যদি হয় তো এই মর্মেই হবে। মাইনরিটি সমস্যার আর কোনো সমাধান আমার জানা নেই। গান্ধীজীও আর কোনো সমাধানের কথা বলছেন না। আমরা যদি অন্য কোনো সমাধানে রাজি না হই তো অপর পক্ষ একদিন এই সমাধানেই রাজি হবে।

আমি পূর্বেই বলেছি যে আমাদের স্বাধীনতা সর্তাধীন স্বাধীনতা। অর্থাৎ এই সর্তে আমরা স্বাধীন হয়েছি যে কংগ্রেস কোনোদিন সারা ভারতের হর্তাকর্তা-বিধাতা হবে না। তার মানে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ কোনোদিন সমগ্র ভারতবর্ষের উপর একচ্ছত্র হবে না। যদি কোনো-দিন হয় তবে ইংরেজ তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে, তার বিরুদ্ধে লীগ ইত্যাদি দলকে উত্তেজিত করবে, অস্ত্র জোগাবে, যুদ্ধ বাধাবে। যেমন করে স্পেনকে, ফ্রান্সকে, জার্মানীকে ইউরোপের ওপর একচ্ছত্র হতে দিল না তেমনি করে কংগ্রেসকে, ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে, ভারতের ওপর সার্বভৌম হতে দেবে না। নিজের সামর্থ্যে যদি না কুলোয় মামার সাহায্য নেবে। মার্কিনকে ডাকবে। অথচ ভারতীয় জাতীয়তাবাদ চিরকাল এ ভাবে আপনাকে সঙ্কুচিত করতে পারবে না। তার ঐতিহাসিক ব্রত হচ্ছে নিখিল ভারতকে এক সূত্রে গ্রথিত ও বৈদেশিক প্রভাবমুক্ত করা। যে ব্রত সে ষাট বছর আগে গ্রহণ করেছে সে ব্রত যত দিন অসমাপ্ত রয়েছে তত দিন তার নিষ্কৃতি নেই। হয়তো আরো ষাট বছর লাগবে ব্রত পূর্ণ হতে। হয়তো এর জন্যে আবার সংগ্রাম করতে হবে বিদেশীর সঙ্গে। চাইকি স্বদেশবাসীর সঙ্গে। ইতিহাসের কাছে সত্যভঙ্গ করা ব্রিটেনের কাছে সত্যভঙ্গ করার চেয়েও ভয়াবহ।

ব্রিটেন এখনো ভারত মহাসাগর পাহারা দিচ্ছে। তার নৌবহর

আমাদের নৌবহরকে কোনো দিনই ভারত মহাসাগরে প্রবল হতে দেবে না। তার যুদ্ধজাহাজের কামানগুলো আমাদের বন্দরগুলোর ওপর গোলাবর্ষণের জন্যে সমস্তক্ষণ প্রস্তুত থাকবে। তার বিমানবহর আমাদের শহরগুলোর ওপর বোমা বর্ষণের জন্যে উদ্যত থাকবে। ব্রিটেনের সঙ্গে বলপরীক্ষা আর যেভাবেই হোক হিংসার দ্বারা হবে না। হলে মহতী বিনষ্টি। আমাদের একমাত্র আয়ুধ চল্লিশ কোটির অহিংসা। সেই চল্লিশ কোটির মধ্যে দশ কোটি মুসলমানও থাকবে। সাম্প্রদায়িকতায় অন্ধ হয়ে আমরা যেন তাদের চিরশত্রু না করি। তারা যদি আমাদের চিরশত্রু করতে যায় তা হলে দেখবে আমাদের অন্তরে তাদের প্রতি বন্ধুভাব রয়েছে। বৈরীভাব নেই। কিন্তু অন্যায় আমরা সহ্য করব না। বন্ধুতার খাতিরেও অন্যায় সহ্য করা যায় না। একজাতীয়ত্বের খাতিরেও না।

সর্তাধীন স্বাধীনতা আমাদের কি দন নিঃশ্বাস ফেলবার সময় দেবে। এই সময়টা যেন আমরা নাচানাচি করে নষ্ট না করি। যে জনসাধারণ আমাদের চরম আশাভরসা, যাদের আমরা নারায়ণ বলে থাকি, সম্প্রদায় নির্বিশেষে তাদের সেবা করে যেন আমাদের সময় কাটে। গঠনের কাজই তাদের সেবা। রাজনীতি যেন গঠননীতি হয়। নইলে অনাবশ্যক শক্তিক্ষয়। পৃথিবীতে দুর্বলের স্বাধীনতা নেই। দুর্বল হলে আমরা সর্তাধীন স্বাধীনতাও হারাব।

(১৯৪৭)

হিংসা ও অহিংসা

ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে পৃথিবীর লোক তার সাক্ষী। কিন্তু যে ভাবে স্বাধীন হয়েছে তাতে অহিংসার জয় প্রমাণিত হয় না। দুনিয়ার লোক তা দেখে অহিংসার শক্তি উপলব্ধি করবে না, অহিংস শক্তির ওপর আস্থাবান হবে না। পনেরোই অগাস্টের পূর্বে তাদের বিশ্বাস ছিল আণবিক বোমাই মানবিক শক্তির চরম উৎকর্ষ। পনেরোই অগাস্টের পরে কি তাদের বিশ্বাস শিথিল হয়েছে? শিথিল হতো, যদি স্বাধীনতার সঙ্গে অহিংসার সংযোগ ঘটত। একটা দেশ যদি অহিংসভাবে স্বাধীনতা লাভ করতে পারে তা হলে আরেকটা দেশ কেন অহিংসভাবে স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারবে না, এ কথা চিন্তা করে তারা সামরিকতার সন্দিহান হতো। একবার যদি তারা সামরিকতায় সন্দিহান হতো তা হলে সামরিকতার প্রস্তুতির পিছনে যে ধনরাশি জলের মতো ব্যয় হচ্ছে, যে মুদ্রাস্ফীতি এক হাতে দুর্মূল্যতা ও অন্য হাতে দুষ্প্রাপ্যতা সৃষ্টি করছে, যে আর্থিক অনর্থ ধনীকে আরো ধনী দরিদ্রকে আরো দরিদ্র করছে, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াত সব দেশে।

বলত, আমরা সহিংসভাবে লড়ব না। লড়তে হয় তো অহিংসভাবে লড়ব। এই যে প্রস্তুতি এ আমরা চাইনে। এর জন্যে যে অর্থব্যয় এ আমরা চাইনে। এই যে মুদ্রাস্ফীতি এ আমরা চাইনে। এই যে অনর্থকারী অর্থনীতি এ আমরা চাইনে। এর নাম যদি ক্যাপিটালিজম হয় এ আমাদের দুচক্ষের বিষ। এর নাম যদি সোশিয়ালিজম হয় এ আমাদের দিল্লীকা লাড্ডু।

ভাবত, আর কি কোনো ব্যবস্থা হতে পারে না? এমন কোনো

ব্যবস্থা যাতে যুদ্ধবিগ্রহের সম্ভাবনা নিহিত নেই, যদি বা থাকে তবে তা অহিংস প্রণালীতে পরিচালিত হতে পারে? এমন কোনো ব্যবস্থা যাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে আণবিক শক্তির আশ্রয় নিতে হয় না, আত্মিক শক্তির ওপর নির্ভর করাই যথেষ্ট?

খুঁজতে খুঁজতে নতুন ব্যবস্থার সন্ধান পেতো। সে ব্যবস্থা ক্যাপিটালিজমও নয়, সোশিয়ালিজমও নয়, উভয়ের গোঁজামিলও নয়, অন্য জিনিস। ক্যাপিটালিজম কেন নয় তার কারণ উক্ত ব্যবস্থা মিলিটারিজমের সাহায্য বিনা টিঁকতে পারে না। জমিদারি চলে না পাইক না হলে, বরকন্দাজ না হলে, পুঁজিদারি চলে না ফৌজ না হলে, কামান বন্দুক না হলে, গোলাবারুদ বোমা না হলে। সোশিয়ালিজম কেন নয়, তার কারণ সোশিয়ালিজম হচ্ছে রাষ্ট্রের জমিদারি, রাষ্ট্রের পুঁজিদারি। কর্তা রাষ্ট্র, কিন্তু কর্ম তো সেই একই। রাষ্ট্র অবশ্য একান্নবর্তী। তাহলেও জমিদারি ও পুঁজিদারির মতো বাহুবল নির্ভর। নইলে কাজ চলে না।

সত্যিকারের নতুন ব্যবস্থা হচ্ছে সেই ব্যবস্থা যাকে খাড়া রাখতে বাহুবলের প্রয়োজন হয় না, তা সে হোক না কেন একান্নবর্তী রাষ্ট্রের বাহুবল। যে দেশে পুলিশ নেই, মিলিটারি নেই, সে দেশে যে ব্যবস্থা আপনার পায়ে আপনি দাঁড়াতে পারবে, অধিকাংশের আন্তরিক সহযোগিতা পাবে, অল্পাংশের বাধা ও ব্যাঘাত হাসিমুখে সহ্য করবে সেই ব্যবস্থাই সত্যিকারের নতুন ব্যবস্থা। তেমন ব্যবস্থার দিকে প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে অহিংসার জয়।

ভারতের স্বাধীনতা অহিংসার জয় প্রমাণিত করছে না। তা বলে অহিংসার পরাজয় ঘটেনি। অহিংসা জয়ী না হলেও অপরাজিত। অহিংসাবাদীদের বিশ্বাস অহিংসা অপরাজেয়। উপরন্তু তাদের বিশ্বাস জনসাধারণ ক্ষণচক্রে সহিংস হলেও স্বভাবত অহিংস। অহিংসাই তাদের

স্বধর্ম, হিংসা পরধর্ম। যদিও এর কোনো উল্লেখযোগ্য প্রমাণ ইতিহাসের পাতায় জমেনি, তবু এটা সত্য, যেমন সত্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব। ভারতবর্ষের স্বাধীনতাসংগ্রামে জনসাধারণের যোগদান ষোল আনা অহিংস নয়, তবু ষোল আনা অহিংসার উচ্চতায় ওঠা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল। জনসাধারণের পরম সম্ভাবনাময় অহিংসায় যাঁদের বিশ্বাস অটুট নয় অহিংসার অপরাজেয়তায় তাঁদের বিশ্বাস অটল হতে পারে না। অহিংসাবাদীরা সেইজন্যে জনসাধারণের সঙ্গে অভিন্ন হবার সাধনায় নিযুক্ত। জনসাধারণের থেকে বিচ্ছিন্ন হলে তাঁদের বিশ্বাসের ভিত্তি দুর্বল হয়। অহিংসার জয় যদি কোনো দিন সুপ্রমাণিত হয় সেদিন দেখা যাবে জনসাধারণ চূড়ান্ত হিংসার সম্মুখে চূড়ান্ত অহিংসার পরিচয় দিয়েছে।

অহিংসা যে পরাজিত হয়নি, এখনো জয়ী হবার আশা ও বিশ্বাস রাখে, আপাতত এই আমাদের যথেষ্ট। এই ভরসায় আমরা নতুন ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখব। রাত্রি এখনো অনেক। ভোরের দেরি আছে। স্বাধীনতা এসেছে, কিন্তু জনজাগরণ আসেনি। এই যে সর্বব্যাপী বিক্ষোভ এর নাম জাগরণ নয়। এটা আপনি থেমে যাবে। একদিন মহাসাধকের ইঙ্গিতে মহাসমুদ্র উদ্বেল হবে। অহিংসার জয় প্রত্যক্ষ করবে পৃথিবী।

(১৯০৭)

ভারতের স্বরাজ

ছেলেবেলায় আমার ধারণা ছিল পৃথিবীতে দু'রকম রাষ্ট্র আছে। মনার্কি অর্থাৎ রাজতন্ত্র। রেপাবলিক অর্থাৎ প্রজাতন্ত্র। মনে মনে রেপাবলিক কামনা করতুম।

বড় হয়ে দেখলুম এহো বাহ্য। আছে দু'রকম রাষ্ট্র। ডেমোক্রেসী অর্থাৎ গণতন্ত্র। ডিকটেটরশিপ অর্থাৎ কর্তৃতন্ত্র। মনে মনে ডেমোক্রেসী কামনা করলুম।

আরো বড় হয়ে আরো দেখলুম। দু'রকম রাষ্ট্র আছে। ক্যাপিট্যালিস্ট অর্থাৎ ধনতন্ত্র। সোশিয়ালিস্ট অর্থাৎ সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্রের শুভকামনা করলুম।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমার চোখ ফুটল। ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র উভয়েরই প্রাণ রণতন্ত্র। যুদ্ধ আছে বলেই তারা বেঁচে আছে। যুদ্ধ উঠে গেলে তারা বাঁচত না। কেন তা বলছি।

যেমন ধনতন্ত্র তেমনি সমাজতন্ত্র উভয়েরই লক্ষ্য অল্পলোকের দ্বারা অধিক উৎপাদন। দু'লাখ শ্রমিক যদি চল্লিশ কোটি বস্ত্রহীনকে বস্ত্র যোগাতে পারে তা হলে ধনতন্ত্র দু'লাখ শ্রমিকের উপযোগী যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও নির্মাণ করে। সমাজতন্ত্রও তাই করে। বস্ত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে তাদের যে নীতি অন্যান্য সামগ্রী উৎপাদনের ক্ষেত্রেও সেই নীতি। সেই নীতি অনুসরণ করতে করতে উভয়েই এমন এক বেকায়দায় পড়ে যে উভয়েরই সামনে লক্ষ লক্ষ বেকার। এই হতভাগাদের জন্যে কাজ সৃষ্টি করতে গিয়ে দেখে কাজ নেই, যন্ত্রপাতি নেই, মূলধন নেই। তখন এদের বেগার খাটানোর মতলব আঁটতে হয়। খাল কাটো,

রাস্তা তৈরি করো, কচুরীপানা ধ্বংস করো, বাড়ী বানাও, বাড়ী ভাঙো, আবার বানাও, আবার ভাঙো, নিত্য নতুন কাজ সৃষ্টি করো, মনে হোক যেন খুব প্রগতি হচ্ছে। রাষ্ট্র তোমাদের খোরাকপোষাকের ভার নেবে। তোমাদের জন্যে বাজেটে থাকবে মোটা বরাদ্দ। কিন্তু কোনো কোম্পানী বা কারখানা তোমাদের দায়িত্ব নেবে না। তোমরা অতিরিক্ত।

এই যে বিরাট অতিরিক্ত জনরাশি, এরাই ক্রমে ক্রমে সামরিক প্রচেষ্টার অঙ্গীভূত হয়। বাজেটে দেখানো হয় যুদ্ধের খরচ এত কোটি টাকা। সেই অতি-পরিস্ফীত মুদ্রারাশির একাংশ যায় এদের জন্যে। যুদ্ধের একটা মস্ত সুবিধা এই যে কচুরীপানা ধ্বংস করতে গিয়ে যত লোক সাপের কামড়ে মরে, জার্মান বা রাশিয়ান ধ্বংস করতে গিয়ে তার চেয়ে বহুগুণ ব্যক্তি কামান বন্দুক বোমার মুখে মরে। তাতে অতিরিক্তদের সংখ্যা কমে। রাষ্ট্রকে আর তাদের জন্যে ভাবতে হয় না। পক্ষান্তরে যুদ্ধের কিছু অসুবিধাও আছে। যুদ্ধ তো কেবল অতিরিক্তদের মারে না। আবশ্যকদেরও মারে। ওপর থেকে যখন বিস্ফোরক নামে, তখন বস্ত্রের উৎপাদক অন্নের উৎপাদক ইস্পাতের উৎপাদককেও মেরে সাবাড় করে দেয়। সেইজন্যে যুদ্ধ যে ধনপতি বা সমাজপতিরা পছন্দ করেন তা নয়। কিন্তু উপায় কী! কচুরীপানায় এমন কী প্রেরণা আছে যে লক্ষ লক্ষ অতিরিক্ত মানুষ নিত্য নিত্য ঐ কর্ম করবে! বাজেটে প্রতি বছর ঐ খাতে টাকা রাখলে করদাতারাও কলরব করবে না এর নিশ্চয়তা কোথায়! রাস্তা কাটো বলার চেয়ে লড়াইয়ের জন্যে রাস্তা কাটো বললে কতখানি প্রেরণা জাগে ভেবে দেখুন দেখি। আর করদাতাদেরও কী রকম ঠাণ্ডা করা যায়!

ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র এক জিনিস নয়। মস্ত তফাৎ একটার সঙ্গে অপরটার। তুলনায়, সমাজতন্ত্রই ভালো। কিন্তু উভয়েরই প্রাণ

হচ্ছে রণতন্ত্র। মানুষকে প্রথমত বেকার করে উভয়েই। তার পর বেগার খাটায় উভয়েই, অবশ্য পেটে ভাতে খাটায়। অবশেষে যুদ্ধে পাঠায় উভয়েই। এর মূল কারণ তাদের উভয়েরই মূলনীতি। অল্প লোককে দিয়ে অধিক লোকের জন্যে উৎপাদন। দু'লাখকে দিয়ে চল্লিশ কোটির জন্যে উৎপাদন এবং সেই উদ্দেশ্যে যন্ত্রপাতি উদ্‌ভাবন ও নির্মাণ। নিছক যন্ত্রপাতির বিরুদ্ধে আমার কিছু বলবার নেই। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে তার উদ্‌ভাবন, নির্মাণ ও ব্যবহার সে উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে বলবার আছে অনেক কথা।

সমাজকে এমন করে ঢেলে সাজাতে হবে যার ফলে যে যার নিজের অন্নবস্ত্র উৎপাদন করবে, এবং সেই উদ্দেশ্যে যন্ত্রপাতি উদ্‌ভাবিত, নির্মিত ও ব্যবহৃত হবে। একই ব্যক্তি সব রকম উৎপাদন একা পারবে না তা জানি। সেরূপ ক্ষেত্রে সমিতি গঠনের ব্যবস্থা থাকবে। তা ছাড়া পালা করে সবাই রাস্তা কাটবে, কচুরীপানা ধ্বংস করবে, ইমারত বানাবে। অতিরিক্ত বলে এক পাল মানুষকে পুষতে হবে না ও বাজে কাজে লাগাতে হবে না। যুদ্ধের ছল করে তাদের মাথা কাটতে ও সংখ্যা কমাতে হবে না। যেখানে সকলেই আবশ্যক, কেউ অতিরিক্ত নয়, সেই রাষ্ট্রই ভারতের স্বরাজ।

(১৯৪৭)

ভারতের ঐক্য

ভারতের ইতিহাসে বার বার দেখা গেছে, কোনো পরাক্রান্ত সম্রাট যদি ওপর থেকে চাপিয়ে না দেন তা হলে ঐক্য জিনিসটা ভারতের স্বভাবে সয় না। ভারতকে ছেড়ে দিলে ভারত সহজেই ছত্রভঙ্গ হয়। তার পরের অধ্যায় আত্মকলহ এবং তার অনিবার্য পরিণাম বৈদেশিক প্রভুত্ব। আবার সেই চাপানো ঐক্য যার জন্যে আমাদের লেশমাত্র কৃতিত্ব নেই, যা গোলামের ঐক্য।

আমরা স্বাধীন হয়েছি এবং ওপর থেকে চাপ সরে যাওয়ায় বিভক্ত হয়েছি। এর পেছনে বিদেশীরও কারসাজি আছে, কিন্তু দেশবাসীর উৎসাহ আরো বেশী স্পষ্ট। আমাদের মুসলমান প্রতিবেশীদের আন্তরিক বিশ্বাস, স্বাধীন ভারত যদি ঐক্যবদ্ধ হয় তা হলে তা হবে হিন্দুপ্রধান রাষ্ট্র। সেখানে মুসলমানদের দশা হবে গোলামের মতো। তার চেয়ে বিভক্ত ভারত ভালো। তা হলে ভারতের একাংশে তারা স্বাধীন মানুষের মতো বাস করবে এবং অপর অংশে যদি গোলামের মতো ব্যবহার পায় তবে সে অংশ ত্যাগ করবে। এই যখন তাদের আন্তরিক বিশ্বাস তখন তাদের সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই এবং তর্ক থেকে একটু এগিয়ে দ্বন্দ্ব করেও লাভ নেই। তার চেয়ে ভারতবিভাগ ভালো এবং সেই সঙ্গে বঙ্গবিভাগ, আসামবিভাগ, পাঞ্জাববিভাগ। এসব চিন্তা করে আমরা ঐক্যবদ্ধ ভারতের সংকল্প স্থগিত রেখেছি। বর্জন করেছি বললে ভুল হবে, কারণ বর্জন করা আমাদের হাতে নয়। ভারত যে ঐক্যবদ্ধ হবে এটা ইতিহাসের ইচ্ছা। ভারতবাসীর দ্বারা যদি এ ইচ্ছা পূর্ণ না হয় তবে বিদেশীর দ্বারা হবে। যেমন অতীতে

হয়েছে তেমনি ভবিষ্যতেও। আবার এ দেশ বিদেশীর পদানত হোক এটা যখন চাইনে তখন একে ঐক্যবদ্ধ করার দায় আমাদেরই বহন করতে হবে। কিন্তু এখন নয়।

আপাতত আমরা হিন্দুমুসলমানের শুভবুদ্ধির কাছে আবেদন করছি। তাদের বিশ্বাস করতে বলছি যে হিন্দুমুসলমানের সম্পর্ক প্রভুভৃত্যের সম্বন্ধ নয়, পাড়াপড়শীর সম্পর্ক। ভাই ভাই বলতে চাইলেও বলতে পারছিনে। মুসলমানের ওপর শোধ তুলতে গিয়ে হিন্দুরাও বহু স্থলে নৃশংস ব্যবহার করেছে। ভাই কখনো ভায়ের সঙ্গে তেমন ব্যবহার করে না। দেশে যখন শান্তি ফিরে আসবে তখন বলব হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই বটে। একই বংশের সন্তান তারা। একই পূর্বপুরুষের রক্ত তাদের দেহে। এ সত্য তাদের চেহারায় আঁকা রয়েছে। এক পোষাক পরলে চেনবার যো নেই কে হিন্দু কে মুসলমান। সেইজন্যে সাহেবী পোষাক পরে নিরাপত্তা খোঁজে উভয়ে। এটা অবশ্য লজ্জার কথা, তবু এতে প্রমাণ করছে তাদের পারিবারিক সাদৃশ্য। এত বড় সত্য কি এক দিন স্বপ্রকাশ হবে না? এর জন্যে কি আমাদের বক্তৃতা দিতে হবে, বিবৃতি ছাপাতে হবে?

আমরা ভাই ভাই না হই, পাড়াপড়শী তো বটে। কী করে এ কথা মাথায় আসে যে হিন্দুরা মুসলমানদের গোলাম, মুসলমানরা হিন্দুদের গোলাম? খ্রীস্টানরা তো সর্বত্র সংখ্যালঘিষ্ঠ। তবে কি তারা সর্বত্র অপরের গোলাম? গোলাম কথাটাকে অকারণে গায়ে পেতে নিলে আলাদা একটা রাষ্ট্র পত্তনের সুবিধা হতে পারে, কিন্তু ইতিহাসের ইচ্ছার প্রতিকূলতা করে কত কাল আলাদা রাষ্ট্র খাড়া থাকবে? এক দিন না এক দিন ইতিহাসের ইচ্ছা পূর্ণ হবে। ভারত ঐক্যবদ্ধ হবে। স্বদেশীরা যদি না করে বিদেশীরা ঐক্যবদ্ধ করবে। আমরা ভাই ভাই মিলে যদি না করি, পাড়াপড়শী মিলে যদি না করি, বাইরের লোক

এসে করবে। সেটা হবে চাপানো ঐক্য। গোলামের ঐক্য। তার চেয়ে ঢের ভালো ঘরোয়া ঐক্য, আপনা আপনি ঐক্য।

আমার এক বিশিষ্ট বন্ধুকে একবার আমি লিখেছিলুম (তিনি যে মুসলমান এ কথা অবান্তর হবে না) বাংলার হিন্দু মুসলমান সংখ্যায় কমবেশী হলেও শক্তিতে সমান। কেন তবে তারা বলপরীক্ষায় নামে? যতবার বলপরীক্ষা করবে ততবার দেখবে কেউ হারবে না, কেউ জিতবে না। দু'পক্ষই সমান। বাংলার সমস্যা ওভাবে মিটবে না। বাংলার হিন্দু মুসলমানকে পরস্পরের শক্তি স্বীকার করে নিতে হবে। যখন লিখেছিলুম তখন এটা স্বীকৃত হয়নি। এখনো হয়নি। কিন্তু এক দিন হবে। এই স্বীকৃতি থেকে আসবে শান্তির স্থায়িত্ব। তার পরের অধ্যায় ঐক্য। পাঞ্জাবেরও সমাধান একই পথে। সেখানেও মুসলমান অমুসলমান সমান সমান। বাংলায় ও পাঞ্জাবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে ঐক্যের জন্যে কাউকে খোসামোদ করতে হবে না। ঐক্য আপনি আসবে।

ভারতের ঐক্য অবশ্যম্ভাবী এবং এর কৃতিত্ব ভারতবাসীরই প্রাপ্য। একবার এটা হৃদয়ঙ্গম হলে হিন্দু মুসলমান পরস্পরের করমর্দন করবে। তখন তারা আন্তরিক বিশ্বাস করবে যে কেউ কারো গোলাম নয়। তখন জাতীয়তার ভিত্তিতে মাইনরিটি অধিকার দাবী করবে এক ভাই, মঞ্জুর করবে অপর ভাই।

(১৯৪৭)

জাতীয় প্রায়শ্চিত্ত

যাঁর অনির্বাণ তপস্যার ফলে স্বাধীনতার স্বাদ পেলুম তাঁরই জীবন-শিখা নির্বাপন করে ও করতে দিয়ে মহাপাতকের ভাগী হলুম আমরা চল্লিশ কোটি নরনারী। সময় থাকতে যদি মহাপ্রায়শ্চিত্ত না করি তবে স্বাধীনতা আমাদের ছাড়বেই, লক্ষ্মী তো অনেকদিন ছেড়েছে।

পৃথিবীর ইতিহাসে এ মহাপাপের তুলনা নেই, কারণ এ অকৃতজ্ঞতার তুলনা নেই। বার্তা যখন কানে এলো প্রথমে বিশ্বাস হয়নি। বিশ্বাস যখন হলো বার বার প্রার্থনা করলুম, হে ভগবান, আমাদের মার্জনা করো। আমাদের ক্ষমা করো।

ইহুদীরা এখনো ক্ষমা পায়নি, দু' হাজার বছর ধরে সাজা পেয়ে আসছে। মান নেই, ইজ্জত নেই, বাসভূমি নেই, এক স্থান থেকে অপর স্থানে বিতাড়িত, লাঞ্ছিত, নিহত। কেন তাদের এই শাস্তি? কারণ তারা তাদের প্রেমিককে বধ করেছিল। আমরাও তাই করেছি। আমাদের পাপের পরিমাণ বেশী, কারণ আমাদের প্রেমিক আমাদের মুক্তির স্বাদ দিয়ে গেছেন।

জগতের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে মাথা আমাদের আবার হেঁট হলো। এই অর্ধ অবনমিত জাতীয় পতাকা কি আবার সগর্বে উড়বে? কে জানে সে কত কাল পরে! তেরো দিন, না তেরো বছর, না তেরো শো বছর!

জনগণের শাশ্বত ক্ষুধা তিনটি। স্বাধীনতার ক্ষুধা, শান্তির ক্ষুধা, অন্নের ক্ষুধা। স্বাধীনতার ক্ষুধা তাঁরই সাধনায় মিটেছে। শান্তির ক্ষুধা তাঁরই প্রভাবে মিটতে যাচ্ছিল। অন্নের ক্ষুধা তাঁরই গঠনপ্রতিভায়

মিটত। তাঁকে যারা অকালে অপসারণ করল তারা কোটি কোটি নিরন্নের মুখের গ্রাস কেড়ে নিল। আর কেড়ে নিল জীবনের শান্তি।

জানিনে প্রায়শ্চিত্তের পদ্ধতি কী, মেয়াদ কতকাল। যে অধর্মবুদ্ধি, যে বিবেকহীনতা সমাজের উচ্চতম স্তর থেকে এ অপকর্মের প্রেরণা ও প্ররোচনা দিয়েছে, হয় তার সংশোধন ঘটবে, নয় তার আশ্রয় ভাঙবে। সমাজের উচ্চতম স্তর ধুলোয় লুটোবে, রাশিয়ার মতো।

হয় চিত্তবিপ্লব, নয় সমাজবিপ্লব। আর নয়তো স্বাধীনতা বিলোপ। সেই সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ, মন্বন্তর। নৈতিক অধঃপতনের শাস্তি এমনি নিষ্ঠুর।

(১৯৪৮)

অপসারণ

মাস ছয়েক আগে যখন ময়মনসিংহ থেকে চলে আসি তখন জন কয়েক বন্ধু বিদায় দিতে এসেছিলেন। তাঁদের বলেছিলুম, "দ্বাপর যুগে তিনি মহাভারতের যুদ্ধ বাধতে দিয়েছিলেন। এবার কিন্তু তিনি মহাভারতের যুদ্ধ বাধতে দেবেন না। বাধা দেবেন।"

বন্ধুরা তা শুনে প্রসন্ন হননি। যুদ্ধ অনিবার্য বলেই তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন। গান্ধীজী বাধা দিলে গান্ধীজীকে তাঁরা বাধা দিতেন। আমার সঙ্গে তাঁদের মতভেদ ঘটলো। মতভেদের মধ্যে আমার বিদায়। তার পরে আমি নিজেই অনেকবার ভেবেছি যুদ্ধ অনিবার্য। যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত না হলে কাশ্মীরের মতো দশা হবে কলকাতার, দিল্লীর। মনটাকে প্রস্তুত করেছি যুদ্ধের জন্যে। অথচ অন্তরাত্মার সমর্থন পাইনি। গান্ধীজী আমাদের সকলের ঘনীভূত বিবেক। বিবেকের সমর্থন পাইনি। যুদ্ধ বাধবে আর গান্ধী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবেন এ কখনো হতে পারে কি? তিনি সহ্য করবেন না, প্রাণ দিয়ে প্রতিরোধ করবেন। জগতের যুদ্ধবিরোধী বিবেকীদের তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক। গত মহাযুদ্ধের সময় তিনি প্রতিরোধের চূড়ান্ত দেখিয়েছেন। সেই তিনি কখনো সহ্য করবেন আমাদের মহাভারতের যুদ্ধ!

আর এ কি শুধু মহাভারতের যুদ্ধ হয়েই ক্ষান্ত হতো? ছড়িয়ে পড়ত না দেশে দেশে? জড়িয়ে পড়ত না ইংলণ্ড, আমেরিকা, রাশিয়া? তৃতীয় মহাযুদ্ধে পরিণত হতো না? মহাযুদ্ধের দিন কে কার স্বাধীনতার মর্যাদা রাখে! যুদ্ধের ফলে স্বাধীনতা বিপন্ন হতো আমাদের। নবলব্ধ

স্বাধীনতা আমরা পোলাণ্ডের মত হারাতুম। দুই দিক থেকে দুই শক্তি এসে ভাগ করে নিত ভারত।

হ্যামলেটের মত প্রশ্ন করছি, যুদ্ধ করব? করব না? করব? করব না? কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছিনে। গীতা বলছে, করো। গান্ধী বলছেন, কোরো না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে U. N. O.র দিকে তাকাচ্ছি। ভাবছি U. N. O. হয়তো এ সমস্যার সমাধান করবে। বৃথা আশা।

ঠিক এই সঙ্কটে—এই উভয়সঙ্কটে—গান্ধীজীর অপসারণ। যারা যুদ্ধ করবে বলে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তারাই তাঁকে সরিয়েছে। তাদের পথের কাঁটা তিনি। পরম বাধা তিনি। তারা তো তাঁকে সরাবেই। আমরা দোদুল্যমানরা তাঁকে ধরে রাখব কী করে! ধরে রাখতে পারতুম যদি স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতুম যে যুদ্ধ করব না। যুদ্ধের বদলে সত্যাগ্রহ করব। কিন্তু অহিংসার উপর সে অলস্ত বিশ্বাস কোথায়! সত্যাগ্রহের জন্যে সে ব্যাপক প্রস্তুতি কোথায়! কাজেই কোনো স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারিনি, অথচ মূঢ়ের মতো প্রত্যাশা করেছি যে যুদ্ধবিরোধীদের মুকুটমণিকে যুদ্ধকামীদের অধীর হস্ত অপসারণ করবে না, যেহেতু তিনি আমাদের প্রিয়তম আত্মীয়।

প্রাণভরে কাঁদতে চাই, কিন্তু কাঁদব কখন? আগে তো একটা স্থির সিদ্ধান্ত নিই, তার পরে কাঁদব। যুদ্ধ না করাই যদি স্থির হয় তবে কাঁদব এই বলে যে সত্যাগ্রহের দিন তোমার মতো ধ্রুবতারা পাব না। আর যদি স্থির হয় যে যুদ্ধ করতেই হবে তবে কাঁদব এই বলে যে, তোমাকে আমরা পরিত্যাগ করেছি, তুমি আমাদের ক্ষমা করো।

সেবার তিনি পার্থসারথি ছিলেন, সেই দ্বাপর যুগে। এবার তিনি পার্থসারথি নন। সব চেয়ে দুঃখ হয় জবহরলালজীর জন্যে।

(১৯৪৮)

আবার এক হাজার বছর

অমন মানুষ এক হাজার বছরে একজন আসেন। আর যে তাঁর মতো মানুষ দেখব না, একথা জানতুম বলে তাঁর শতবর্ষ পরমায়ু কামনা করেছি। তাঁর শরীরমনের গাঁথুনি যেমন তাতে তাঁর পক্ষে শতবর্ষ জীবিত থাকা বিচিত্র ছিল না। তাঁর নিজেরও কামনা ছিল একশো বছর বাঁচতে, তাঁর সত্যের পরীক্ষা সমাপ্ত করতে। সে পরীক্ষা কেবল ভারতের জন্যে নয়, সারা পৃথিবীর জন্যে। এক আধ শতাব্দীর জন্যে নয়, এক হাজার বছরের জন্যে। তাঁর উপর, তাঁর পরীক্ষার উপর নির্ভর করছিল কোটি কোটি মানুষের পুরুষানুক্রমিক ভাগ্য। তাদের পরম ভাগ্য থেকে তাদের যারা বঞ্চিত করেছে, সেই হীন আততায়ীর দল এবং তাদের পিছনে যারা কলকাটি নেড়েছে সেই স্বার্থসর্বস্ব উচ্চ শ্রেণী একদিন ইতিহাসের দ্বারা দণ্ডিত হবে নিশ্চয়। ইতিহাস তাদের নিজেদেরই বুকে তিনটি বুলেট বিদ্ধ করেছে। এবং ঘড়ি ধরে দাঁড়িয়ে দেখছে শেষ নিঃশ্বাস পড়তে কত দেরি।

তাদের তো যা হবার তা হবে, কিন্তু আমাদের কী হবে—আমরা যারা তাঁর সত্যের পরীক্ষার দিকে সূর্যমুখীর মত দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলুম? আমাদের পরম ভাগ্য থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি বলে কি আমরা হতাশের মতো হাল ছেড়ে দেব, হাজার বছর হালছাড়া হয়ে কাটাব? না, আমরা হাল ছেড়ে দেব না। আমরা সেনাপতিহারা সৈনিকের মতো সামনের দিকে এগিয়ে যাব। সেনাপতি নেই, কিন্তু তাঁর রণপদ্ধতি জানা আছে। সেই রণপদ্ধতির আদি অন্ত তিনি আমাদের শিখিয়ে গেছেন। কেমন করে বাঁচতে হয়, তাও আমরা শিখেছি।

কেমন করে মরতে হয় তাও। এ শিক্ষা যদি আমাদের জীবনে ব্যর্থ হয়, তবে তা আমাদেরই দীনতা। আর কোনো জাতি এ শিক্ষা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। আর কোনো দেশ গান্ধীবাদী হবে। আমাদের জীবনে যা ব্যর্থ হবে, আর কারো জীবনে তা সার্থক হবে। ইতিহাস তাকে সার্থক করবেই।

ইতিহাসের গান্ধীযুগ শেষ হয়নি, শেষ হতে অন্তত এক হাজার বছর। আমরা সে যুগের প্রারম্ভ দেখেছি। পরিণতি দেখবে ভাবী কালের মানুষ। এই অবিশ্বাস্য নিয়তি, এই সীমাহীন শোক, এই অন্তহীন অবসাদ, এই অনপনেয় কলঙ্ক, এই গভীর লজ্জা, এই দুর্জয় ক্রোধ সবই কাজে লাগবে, সক্রিয় হবে। পরিণতির দিক থেকে দেখলে সব কিছুরই মূল্য আছে।

(১৯৪৮)

মর্ত্ত্য হইতে বিদায়

শান্তি যদি কারো প্রাপ্য হয় তবে তা রবীন্দ্রনাথের। কারণ তাঁর সমস্ত জীবন কেটেছে নিরবচ্ছিন্ন শ্রমে। যে বযসে লোকে অবসব ভোগ করে, সে বয়সেও তাঁর একদিনও বিরাম ছিল না। লেখনী তুলে রাখলে তুলি তুলে নিতেন, তুলি যদি থামল, গানের আসর কিংবা নাচের আয়োজন তাঁকে ব্যাপৃত রাখল। গত বছর এমন সমযেও তিনি সাহিত্যের ক্লাস করেছেন। কোনো দিন দিবানিদ্রাকে প্রশ্রয় দেননি, সূর্যোদয থেকে সূর্যাস্ত সমানে কাজ করেছেন। রোগশয্যাকেও তিনি কর্মক্ষেত্র কবতে পারলে ছাড়তেন না। ইংরেজী "গীতাঞ্জলী" তো রোগশয্যার কীর্তি। এমন অক্লান্ত ও একাগ্র তপশ্চর্যা সব দেশেই সব যুগেই বিরল। আমাকে বলেছিলেন,"আমিও কি লিখতে চাই হে! সম্পাদকরা জোর করে লিখিযে নেয়।" এই বলে ছবি আঁকতে বসলেন। আসলে তাঁব স্বভাবটা ছিল শ্রমিকের। অবসর তিনিও চাননি, তাঁকেও কেউ দেয়নি। কোথায চীন, কোথায় আর্জেন্টাইনা— কারো মেযের বিয়ে, কারো ছেলেব নামকরণ—ডাক রবি ঠাকুরকে। রবি ঠাকুরও "না" বলবার পাত্র নন। গত বছর চীনদেশেব মন্ত্রী এসে বলে গেলেন, "আপনার জন্যে পুষ্পক বিমান পাঠাব। আপনি যাবেন তো?" ইনিও রাজি হলেন। চীনদেশেব কথায মনে পড়ল কয়েক বছর আগে আমাকে বলছিলেন, "একটা লোভনীয নিমন্ত্রণ এসেছে হে। চীনদেশ থেকে। কিন্তু কী করে যাই? যুদ্ধ বাধবে শুনছি।" চীনদেশের প্রতি তাঁর প্রগাঢ়তম শ্রদ্ধা ও প্রীতি ছিল। অন্য কোনো দেশকেই তিনি এত ভালোবাসেননি, ভারতকে বাদ দিলে। চীনা

অধ্যাপক যখন প্রস্তাব করলেন গত বছর, "গুরুদেব, খাবার তৈরি করে পাঠাব ?" গুরুদেব খুশি হয়ে বললেন, "নিশ্চয়।" কী জানি কী সে খাদ্য! পাঁচশো বছরের পুরানো ডিম না পাখীর বাসা!

স্বর্গ যদি কারো প্রাপ্য হয় তবে তা রবীন্দ্রনাথের। কারণ সমস্ত জীবন কেউ এমন সুন্দর ভাবে কাটায়নি। অসুন্দর কাজ, অসুন্দর কথা, অসুন্দর চিন্তাকে তিনি অশুচি জ্ঞান করতেন। তিনি ছিলেন সত্যিকারের অভিজাত, ইংরেজীতে যাকে বলে nobleman, তাঁর নোবিলিটি শত্রু মিত্র সকলেই স্বীকার করে নিয়েছে। লণ্ডনের 'টাইম্‌স্‌' পত্রিকা পর্যন্ত। তিনি যখন রাগতেন তখন দারুণ রাগতেন, কিন্তু ভুলেও অশোভন উক্তি করতেন না। মুখের উপরে লেখনীর উপরে তাঁর কঠোর শাসন ছিল। জীবনের কোনো অবস্থাতেই তিনি আপনাকে খেলো হতে দেননি। অথচ তিনি বেশ সহজ মানুষ ছিলেন, হাস্য পরিহাসে তাঁর দোসর ছিল না। গান্ধীজীকে একটি মেয়ে কেমন জব্দ করেছিল সে গল্প তাঁর কাছে দু'বার শুনেছি। অবশ্য বলতে সাহস হয়নি যে জব্দ হয়েছিল সেই মেয়েটিই—গান্ধী নন। রবীন্দ্রনাথের স্নেহ লাভ করা সকলের পক্ষেই সম্ভব ছিল। তবে তাঁর নিজের কাজ নিয়ে এতটা তন্ময় থাকতেন যে, সামাজিক মানুষের স্নেহের দাবী মেটাতে সময় পেতেন না। তাঁর সঙ্গে দীর্ঘকাল বাস করলে তবেই তাঁর স্নেহপরায়ণতার পরিচয় ধীরে ধীরে প্রকট হতো। তাঁর স্নেহ-পরায়ণতার অন্যায় সুযোগ নিয়েছেন অনেক প্রিয়পাত্র। প্রমাণ না পেলে তিনি কাউকে সন্দেহ করতেন না, মানুষের উপরে তাঁর অবিচলিত বিশ্বাস ছিল। জীবনে তিনি বহু বঞ্চনা সয়েছেন, অপবাদ তো তাঁর চিরসঙ্গী ছিল। তা সত্ত্বেও তিনি মানুষের উপর বিশ্বাস হারাননি, সেই বিশ্বাস তাঁকে শেষ দিন পর্য্যন্ত তিক্ততা হতে রক্ষা করেছিল। তাঁর কর্মজীবন ছিল যেমন অবসাদহীন, তাঁর মনোজীবন ছিল তেমনি

তিক্ততাহীন। সেইজন্যে শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর কায়িক ও মানসিক সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ ছিল।

রবীন্দ্রনাথ যা সমস্ত জীবন ধরে অর্জন করেছেন এখন তিনি তা সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করুন। উপভোগ করুন শান্তি, উপভোগ করুন স্বর্গ। মুক্ত আত্মারা, দেবতারা তাঁকে নিজেদের মধ্যে লাভ করলেন। আমরা মানুষেরা তাঁকে হারিয়েছি বটে, কিন্তু যে পথ দিয়ে তিনি সেখানে গেছেন সেখানকার সেই পথ তো পড়ে রয়েছে। পুনর্দর্শন কি কোনো দিন হবে না যে শোকে মুহ্যমান হব?

"দাও, খুলে দাও দ্বার, ওই তার বেলা হলো শেষ
বুকে লও তারে।
শান্তি অভিষেক হোক, ধৌত হোক সকল আবেশ
অগ্নি উৎস ধারে।

সীমন্তে গোধূলি লগ্নে দিয়ো এঁকে সন্ধ্যার সিন্দুর
প্রদোষের তারা দিয়ে লিখো রেখা আলোক বিন্দুর
তার স্নিগ্ধ ভালে।
দিনান্ত সঙ্গীতধ্বনি সুগম্ভীর বাজুক সিন্ধুর
তরঙ্গের তালে॥"

(১৯৪১)

রবীন্দ্রনাথের পরিচয়

অন্যান্য মহাশিল্পীদের মতো রবীন্দ্রনাথেরও দ্বিবিধ পরিচয়। এক দিক থেকে তিনি দেশকালের অধীন, আর একদিক থেকে দেশকালের ঊর্দ্ধে।

যে রবীন্দ্রনাথ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র, বাংলাদেশের কবি, ভারতবর্ষের কণ্ঠস্বর, বিশ্বমানবের মিলনদূত, যিনি সমাজ ধর্ম শিক্ষা প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়ে চিন্তা করেছেন, যিনি শান্তিনিকেতনের আশ্রম-গুরু ও বিশ্বভারতীর প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা, যিনি যেদেশেই গেছেন সেদেশেই রাজসম্মান লাভ করেছেন সেই রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসের সৃষ্টি ও ইতিহাসের পাত্র। কী করে তিনি সম্ভব হলেন, কী করে তাঁর বিকাশ হলো, কী খেয়ে তিনি "উর্ব্বশী" লিখেছিলেন, কী পরেছিলেন "বিসর্জ্জন" অভিনয়-কালে, কোন সাবানে হাত ধুয়ে কোন কলম হাতে নিতেন, এ সব তথ্য ক্রমে ক্রমে উদ্‌ঘাটিত হবে। কত লোক "এ সব করিয়া বাহির বড় বিদ্যা করিবে জাহির।" পণ্ডিতেরা বিবাদ করবেন "লয়ে তারিখ সাল।" সমাজ-নীতির অধ্যাপক বলবেন, রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে হলে মনে রাখতে হবে যে তাঁর পশ্চাতে ছিল বহু পুরুষের সঞ্চিত বিত্ত, জমিদারী ও কাটাকাপড়ের একচেটে কারবার—এবং বিত্তসাপেক্ষ সংস্কৃতি। ছাত্রেরা বলবে, এখন ঠিক বুঝেছি "গীতাঞ্জলি"র অর্থ কী। "বলাকা"র কী তাৎপর্য।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং আমাদের সতর্ক করে দিয়ে গেছেন, "কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে।" অথবা তাহার যুগের চরিতে। অথবা তাহার দেশের চরিতে। কবির অন্তরে যে চির বসন্ত ছিল সেই স্বর্গীয় শক্তি ইতিহাসের বন্দী নয়। পৃথিবী তার যাত্রাপথের এক প্রান্তের ব্যাকুল বেণু। বাঁশের বাঁশীতে বাজে নন্দনের পূর্ণ শ্বাস ভরা অপার্থিব

সুর। অনুরণন ফুরায় না বসন্তবিদায়ের বহুকাল পরেও। তাকেই বলা হয় কাব্যের অমরতা। যে রবীন্দ্রনাথ বসন্তপ্রতিম, যিনি তরুণতম, ঐতিহাসিকেরা তাঁকে চিনবেন না, পণ্ডিতেরা তাঁকে বুঝবেন না। যারা তাঁরই মতো যাত্রাপথিক তারাই শুধু নিজ নিজ অনুভবের আলোয় তাঁকে আবিষ্কার করবে।

(১৯৪১-৪২)

রবীন্দ্রাদিত্য

আজ যতক্ষণ কুয়াসা ছিল ততক্ষণ সবটা জোরের সঙ্গে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে কুয়াসার ওপারে কোটি সূর্য্যের শোভাযাত্রা চলেছে, তারা সবাই মিলে এত আগুন জালিয়েছে যে সেই আগুনের ধোঁয়ায় আকাশ হয়ে গেছে কালোয় কালো। ততক্ষণ আমার মনে হচ্ছিল আমার চোখে যেন কে একখানা glare protector চশমা পরিয়ে দিয়েছে, যেদিকে তাকাই সেই দিকে ছাই রঙ।

সন্ধ্যা বেলা সে চশমা সরিয়ে নিলে। দেখলাম চাঁদ উঠেছে, জ্যোৎস্নার লহর ছুটেছে, আকাশ সরোবর এত নির্ম্মল যে তল পর্যন্ত চোখ যায়। তখন মনে হলো আমি এই তুচ্ছ লণ্ডন শহরের বাসিন্দা নই, এই ক্ষুদ্র পৃথিবীটিতেও আমাকে ধরছে না, ঐ যে আকাশ-সরোবরের তলে স্ফটিক নির্ম্মিত স্তম্ভ, ওরি ভিতরে লুকানো একটি কৌটায় আমার প্রাণ স্পন্দিত হচ্ছে, সেই স্পন্দন আমি বুকে হাত রেখে গুণতে পারছি। তখন মনে হলো আমি কি বিরাট, আমি কি অমেয়! আমার বুকের সঙ্গে আমার হাতের ব্যবধান এক আধ ইঞ্চি নয়, নিযুত নিযুত যোজন, একের স্পন্দন আরেকের কাছে ধরা পড়তে এক আধ সেকেণ্ড নয়, শত শত সহস্র বছর লাগে। আমি কালাতীত, আমি চিরন্তন।

নিজের এই বিশ্বরূপদর্শন জীবনে প্রতি দিন ঘটে ওঠে না, লণ্ডনে যেমন কুয়াসা লেগেই থাকে জীবনেও তেমনি আত্মবিস্মৃতি লেগেই থাকে। কদাচ এক আধ দিন আবছায়া মতন মনে হয় আমি অমৃতস্য পুত্রঃ, আমার দেহ মন আমার পৃথিবী আমার আকাশ—সবই যেন একখানা কুয়াসা মাত্র, এ সবকে তুচ্ছাদপি তুচ্ছ করে আমি কোটি সূর্যের মুকুট পরে জ্বলছি, আমি দিব্যতেজাঃ, আমি চিরযৌবন।

পরমমুহূর্তেই অবিশ্বাসের ভারে শুয়ে পড়ি। তখন কিছুতেই ধারণা হয় না যে আমি স্থান কালের কুয়াসায় বদ্ধ কত লোকের অনুগ্রহনির্ভর সামান্য একটা মানুষ ছাড়া আর কিছু, এতো অসহায় যে আমার জীবনটাই যেন একটা ঘটনাচক্রে ঘটে যাচ্ছে গোছের ব্যাপার, উপর দিয়ে একখানা মোটর চলে গেলে কিংবা ভিতরে গোটা কয়েক ব্যাসিলি বাসা বাঁধলেই সব শেষ। যেন আমি নিয়তির হাতের একটা কলের পুতুল, সেও যেমন অন্ধ আমিও তেমনি মুক, সে যখন আমাকে ভুল করে ভেঙে ফেলে আমি তখন তাকে নালিশটাও জানাতে পারিনে। এমনি আত্ম-অবিশ্বাসের সময় ওমর খৈয়াম খুলে বসি, তাঁর রচনা এক পেয়ালা মদের মতো সব গ্লানি ভুলিয়ে দেয়। কিংবা এইচ জী ওয়েল্‌সের সঙ্গে আফিং খেতে বসে যাই, মন উড়তে থাকে সুদূর ভবিষ্যতে, যেখানে সবই কেমন করে ঠিক হয়ে গেছে, মাটির উপরে স্বর্গ নেমে এসেছে, দুঃখ দ্বন্দ্ব দুর্ভাবনা চিরকালের মতো শেষ।

কিন্তু মদ বা আফিং খাবার মতো বিলাসিতাও আমাদের সাজে না। আমাদের কুয়াসা-ঢাকা প্রাত্যহিক জীবনে আমরা কলুর চোখঢাকা বলদের মত ঘুরে মরি। উদরান্নের তাড়নার উপরে একটু রংচং ফলিয়ে গাধা খাটুনীর গাধার টুপির উপরে "dignity of labour" এঁকে, কাজের মানুষ আমরা কেবল কাজই করি, কাজের ঘণ্টা থেকে চুরি করে যদি বা এক আধ ঘণ্টা খেলা করি তো অমনি বিবেকে বাধে, সেজন্যেও নিজের কাছে ও পরের কাছে কৈফিয়ত দিতে হয় যে সেটা নিছক সময় নাশ নয়, সেটা efficiencyরই অঙ্গ, সেটাও দরকারী। আমাদের জীবনের আগাগোড়াই যে দরকারী, আমরা যে অদরকারের ধার দিয়েও যাইনে, এই আমাদের প্রধান গর্ব, এবং অদরকারীর কিছু দৈবাৎ করে বসি তো আমাদের লজ্জার সীমা থাকে না।

এই যে দাস মৌমাছির মতো দরকারী হবার গর্ব এ যে আসলে

কত বড় একটা গ্লানি তা আবছাখামতন মনে হয় যে দিন কুয়াসার ঠুলি খসে পড়ে, জগতের ঐশ্বর্যময রূপ চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, সহসা আবিষ্কার করি আমরা রাজা, আমাদেব এই সাতমহলা প্রাসাদের যেখানে চোখ পড়ে সেখাতে কোহিনুব সেখানে ময়ূর সিংহাসন। তখন একটি মুহূর্তে আমরা নিরবধি কালেব বাজত্ব ভোগ কবে নিই, কোথাব ধোঁয়া হযে মিলিয়ে যায সমাজের দরকাবী চাকব হবাব ইতর গর্ব, তখন আমরা লীলাময, লীলার আনন্দে কোটী মন্বন্তব অতিবাহিত করি, কিন্তু এমনি নিবিড় সে আনন্দ সে দেখতে দেখতে কোটি মন্বন্তর কেটে যায়, ঘড়ি খুলে দেখি মাত্র একটা মিনিট কেটেছে।

২

আমরা কাজের মানুষ ; আমাদের জীবনের ঘড়িতে এমন একটা মিনিট কদাচ বাজে কি-না সন্দেহ। কিন্তু মনে করা যাক এমন একজন মানুষ আছেন যাঁর ঘড়িই নেই. যাঁর সময় মিনিট দিয়ে ভাগ করা যায না। মিনিট তো পৃথিবীর অক্ষাবর্তনের ২৪ ভাগের ৬০ ভাগ। যাঁকে পৃথিবীতে ধবে না, যিনি অসীম জগতে বাস করেন তাঁর জীবনকে মিনিট দিয়ে ভাগ করাও যা মন্বন্তব দিযে ভাগ করাও তাই। তিনি মহাকালেব সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে নিজের পরমায়ুটাকে কেবল অসংখ্য মুহূর্ত দিয়ে নয অসংখ্য মন্বন্তর দিয়ে গেঁথেছেন এবং অসমাপ্য মালা-খানিকে স্বযং মহাকালের কণ্ঠে দিয়েছেন।

এমন মানুষকে আমরা ভালো বুঝতে পারিনে, আমাদের সঙ্গে এঁর এতই অমিল। ইনি স্কুলে কলেজে পড়তে যাননি, আপিসে আদালতে খাটতে যাননি, সামাজিকতা করতে পার্টিতে যাননি, ইনি অপথে

বিপথে বেকার বেড়িয়েছেন, পথের শেষে যে কোথাও একটা পৌঁছাতে হবে এমন তাড়া ইনি একেবারেই বোধ করেননি, এঁর জীবনটাই একটা খেলার ছুটী। লোকে ঘর বাঁধে আকাশ বাতাসকে বাইরে রাখতে, ইনি নদীতে নদীতে নৌকায় নৌকায় ভেসেছেন আকাশ বাতাসকে অন্তরে রাখতে। দিনের পর দিন এই বিশাল জগৎ এর সূর্য নক্ষত্র আলোক অন্ধকার শরৎ বসন্ত ফুল পাখী নিয়ে এঁর অণুতে অণুতে অনুপ্রবিষ্ট হলো এবং এঁকে আপনার মতো বিশাল করে তুললো। যে দেশে এঁর বাস সে দেশের আকাশে রাত্রিদিন উৎসব চলে, যেন ইন্দ্রসভা। জন্মক্ষণ থেকে সেই সভার নিমন্ত্রণ যিনি পেয়েছেন তিনি কি কখনো সেখান থেকে নড়তে পেরেছেন ফিরতে পেরেছেন? সামান্য পৃথিবীর সামান্য তর্কসভায় কি কেউ কোনো দিন তাঁকে দেখতে পেয়েছে? তিনি ইন্দ্রসভার সভাসদ, তিনি তেত্রিশ কোটি অদিতি সন্তানের একতম, তিনি আদিত্য। আকাশের সূর্যদেবের সঙ্গে এক সারিতে তাঁর আসন। ঐশ্বর্যের অমৃত সেবন করতে করতে তিনি মুহূর্তে মুহূর্তে অমর হলেন। সেই অমরত্বের কতক ধরা পড়লো তাঁর সৃষ্টিতে, কতক থেকে গেল সৃষ্টির অতীত। ব্যক্ত করবার পক্ষে এত আনন্দ তিনি পেয়েছেন যে কবিতায় প্রবন্ধে গল্পে ও গানে লক্ষ বার লক্ষ ভাবে লক্ষ ভঙ্গীতেও ব্যক্ত করে উঠতে পারেননি, ব্যক্ত করবার আবেগে বাষ্পাকুল হয়েছেন। এই বাষ্পাকুলতা তাঁর রচনাকে চিত্র-বিচিত্র করেছে, আলোর সঙ্গে ছায়ার মতো, সত্যের সঙ্গে হেঁয়ালির মতো, জীবনের সঙ্গে মরণের মতো।

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি এই বিশ্বসৃষ্টির মতো। বিশ্বস্রষ্টার অন্তরে নিজেকে ব্যক্ত করবার যে প্রচণ্ড আবেগ আছে সে আবেগের যতটুকু তিনি ব্যক্ত করেছেন তার তুলনায় অনেক অনেক বেশী তিনি ব্যক্ত করতে চাইছেন; বিশ্বসৃষ্টি হচ্ছে যা হয়েছে ও যা হতে চাইছে দুইয়ের সমন্বয়; একাধারে

মর্ত্ত্য ও স্বর্গ, মাটি ও বাষ্প, বৃক্ষ ও বীজ। যারা নাস্তিক তারা স্রষ্টার সৃজনাবেগ সম্বন্ধেই নাস্তিক, তারা গানটুকু শোনে রেশটুকু শোনে না, রূপটুকু দেখে ইঙ্গিতটুকু দেখে না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গুরু বিশ্বকবির কাছে পাঠ নিয়েছেন, তাঁর সৃষ্টি বিশ্বসৃষ্টির মতোই সৃজনের আবেগে পরিপূর, তাঁর রচনায় ব্যক্তির চেয়ে ব্যঞ্জনাই বেশী। সেইজন্যে তাঁর রচনাকে একবার পড়ে শেষ করে দেবার উপায় নেই। লক্ষ বার পড়তে হয়, লক্ষ বার বুঝতে হয়। যাদের ধৈর্য অল্প তারাই নাস্তিক হয়ে একরকম সস্তা শান্তি পায়, তারাই লেখা পড়ে' ঐ কাগজের আগুনে চায়ের জল গরম করতে বসে। তারা খোঁজে একটা হাতে হাতে পাবার মতো অর্থ, একটা practical use, একটা উপকার। এসব লোকের পক্ষে "গীতিমাল্যে"র চেয়ে "কথামালা" বড়, "ফাল্গুনীর" চেয়ে "নীলদর্পণ" বড়। রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বার্ণার্ড শ বড়।

আর যারা অমৃত চায়, যাদের ধৈর্য অসীম, যারা ওঁ নামক একটিমাত্র শব্দের জন্য একটা জীবন দিয়ে ফেলাকে সামান্য দান মনে করে তাদেরি জন্যে রবীন্দ্রনাথ। তারা তাঁর এক একটি রচনাকে এক একটি ফুল বা এক একটি তারার মতো ভোগ করে, গন্ধ থেকে রূপ থেকে বুঝতে পারে এর শিরায় শিরায় জীবন শিহরিত হচ্ছে, জীবনেরই মতো এ এক মরণাতীত রহস্য। রসিকের জন্যে এর সৃষ্টি। ক্ষুধার্তের জন্যে এ নয়। যে মানুষ ক্ষুধার দাস, জরা ব্যাধি মৃত্যুর শাসনাধীন, কর্মচক্রের মৌমাছি, সে তো রাজা নয়, রাজভোগের মূল্য সে কি বুঝবে? তাকে আকাশভরা তারার সঙ্গে ভোগে না বসিয়ে দিয়ে কাঙালী-ভোজনে পাঠিয়ে দিলে সে খুশি হয়।

আমরা যখন খেলার আনন্দে খেলা করি তখনি আমরা মুক্ত, আমরা রাজা, আমাদের হাতে যুগ-যুগান্তকাল সময়, আমাদের

হাতে জগৎ ভাণ্ডারের সোনার চাবী। আমাদের কিসের অভাব যে অভাব হাতে করে কবির সম্মুখে দাঁড়াবো, বলবো আমাদের ক্ষুধা মেটাবার মতো কিছু ভিক্ষা দাও, কাজে লাগাবার মতো কিছু পরামর্শ দাও। রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাক্ষাৎকারের জন্যে যখন যাই তখন আমাদের রাজবেশ পরে' যেতে হয়, সেই রাজবেশ যে বেশ আজ সন্ধ্যাকালে আমি পরেছিলাম, যে বেশ সকলেই আমরা মাঝে মাঝে পরে' থাকি। রাজবেশ বললাম বটে, কিন্তু কাঞ্চনমূল্য এর নেই, এ বেশ ধুলায় ধূসর শিশুর অঙ্গেও আছে। রবীন্দ্রনাথের খাঁটি সমজদার আমি অত্যন্ত অল্পশিক্ষিত চাষার মধ্যেও দেখেছি। সে যেমন মেঠো ফুলের কিংবা বাঁশের বাঁশীর কিংবা বৈশাখী ঝড়ের কিংবা বেনো জলের সমজদার, তেমনি রবীন্দ্রনাথেরও সমজদার। সে যেমন লাঙল ঠেলে, মৃদঙ্গ বাজায়, হা-ডু-ডু খেলে ও ধানে বোঝাই নৌকা চালিয়ে শহরে শহরে যায়, তেমনি রবীন্দ্রনাথের গান গায়, সেটাও তার পক্ষে একটা adventure। সে তো অভাবগ্রস্তের মতো অর্থ চায় না, সে চায় উদ্বৃত্ত।

যত বিপদ কেবল আমাদের মতো Philistineদের বেলা, আমরা যারা হক্ পয়সা দিয়ে 'value' কিনি, কাগজের দর কালির দর হিসাব করে' লেখার দর কষি, আমরা যারা রাজসাক্ষাৎকারে যাবার সময় তারা-ঝলমল উন্মুক্ত আকাশের উদার রাজবেশখানি পরতে ভুলে যাই, আমরা যারা শ্রদ্ধার পাত্রকে শ্রদ্ধা দেখাতে কুণ্ঠিত হয়ে নিজেকে শ্রদ্ধেয় করে তুলতে পারিনে। আরো বিপদ আমরা যখন একো জনা একো রকম দাবী নিয়ে কবিকে ব্যতিব্যস্ত করতে যাই; যখন একজন বলি, তোমার লেখায় দেশের সুবিধা কতটুকু হলো; একজন বলি, তোমার লেখায় দীনদরিদ্রদের proletarianদের অভাব অভিযোগ ফুটে উঠলো না কেন; একজন বলি, তোমার লেখায় জীবনের বাস্তব

প্রতিকৃতি কোথায় ? এত প্রশ্নের ঝাপ্‌টা সয়েও কবি নিরুত্তর থাকেন —থাকতে পারেন ! এও তাঁর ক্ষমতার পরিচায়ক। "Others abide our question, thou art free !"

৩

যে নারী নিজে মা হয়েছে যেকোনো মায়ের ছেলের প্রতি তার একটি স্বাভাবিক দরদ আছে, যেন তার জন্মে সেও দায়ী। কোনো মতেই সে নিরপেক্ষ বিচারকের মতো আরেক মায়ের ছেলের দোষগুণ তৌলে দেখতে পারে না, কেমন করে দোষগুলো তার চোখ এড়াতে চায় কিংবা তার হৃদয় থেকে সমর্থন টেনে আনে। আর সে যদি তার প্রিয়সখীর ছেলে হয়ে থাকে তো তার সাত খুন মাপ, সে নিজের ছেলেরও বাড়া।

রবীন্দ্রনাথ স্রষ্টা। এই বিচিত্র বিশ্বসৃষ্টির প্রতি তাঁর একটি অহেতুক দরদ আছে, এও যে আরেক স্রষ্টার বড় বেদনার সৃষ্টি। সেই আরেক স্রষ্টাকে রবীন্দ্রনাথ প্রিয়তম বন্ধুর মতোই চেনেন, এবং ভালবাসেন, আজন্ম তিনি তারই সঙ্গে তো অপথে বিপথে ঘুরেছেন আকাশে বাতাসে মাটিতে নদীতে; সকল আত্মীয়ের মধ্যে তিনিই তো তাঁর আত্মীয়তম। রবীন্দ্রনাথ জীবনে একটা দিনও নাস্তিক হতে পারেননি, সংশয়ী হতে পারেননি, একটা দিনও ভাবতে পারেননি যে জগৎ একটা মায়া কিংবা একটা প্রাণহীন আত্মাহীন জড়পিণ্ড। গানের বেদনা কণ্ঠে নিয়ে তাঁর জন্ম, প্রথম থেকেই উপলব্ধি করেছেন তাঁরই গানের মতো এই জগৎটিও কার একখানি গান, মমতায় দরদে দায়িত্বে তাঁর স্রষ্টা-হৃদয় একে একবারও বিচার করেনি, সন্দেহ করেনি,

একে ভালোবেসেছে বিশ্বাস করেছে সমর্থন করেছে। জীবন ভরে' তিনি অনেক দুঃখও পেয়েছেন, অনেক দুঃখই দেখেছেন, বন্ধুর উপরে অভিমানও বড় কম করেননি, কিন্তু বন্ধুর সৃষ্টি তাঁর এতো প্রিয় যে একবারও তিনি তাকে দূর দূর করে' সংস্কারকের মতো ঝাঁটা নিয়ে তাড়া করলেন না কিংবা তার থেকে দূরে পালিয়ে বৈরাগীর মতো শবাসীন হলেন না। তিনি তার সমস্ত দায়িত্ব স্বীকার করে নিলেন, তার অসংখ্য বন্ধন। সে যেন তাঁরই একখানি গান, তাঁর একখানি কবিতা, তার কত ছন্দপতন, কত বেসুর, কত ত্রুটি, তবুও সে সুন্দর, সে ভালো, সে সত্য।

নিখিল বিশ্বকে একান্ত আপনার করতে পেরেছেন বলে' রবীন্দ্রনাথ কোনো দিন তথাকথিত realist হ'তে পারেন নি। তিনি ঠিক জেনেছেন কুয়াসার ওপারে কোটি সূর্যের শোভাযাত্রা, দুঃখের আড়ালে পরম আনন্দের আয়োজন, মৃত্যুর মুখোস পরে' নবজাত শিশুর হাসি। বৃহৎ জগতে ও বৃহৎ কালে বাস করতে করতে রবীন্দ্রনাথের দূরদৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি দুই হয়েছে বৃহৎ। তিনি যা দেখেছেন তাই বৃহত্তর reality—তার "কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু কোথা বিচ্ছেদ নাই।" তিনি ঠিক জেনেছেন আমরা ছদ্মবেশী রাজা, আমাদের মধ্যে যে নিকৃষ্টতম সেও। আমাদের দোষগুলো রাজকীয় রকমের, আমাদের দুঃখগুলোও রাজকীয়। একবার যদি আমরা নিজের গভীরতম পরিচয়টিকে নিজের হৃদয়ে সত্য করে' পাই তবে কি আমরা সহস্র বন্ধনের মাঝে মুক্তির স্বাদ পাইনে! তবে কি আমরা একে তাকে ওকে দোষ দিয়ে সমস্ত সৃষ্টির বিরুদ্ধে মূর্তিমান নালিশের মতো দাঁড়াই; এর কাছে তার কাছে ওর কাছে হাত পেতে সমস্ত সৃষ্টির চোখে হেয় হই!

আমাদের প্রত্যেকের যে আইডিয়াল দিকটি আছে, যেখানে আমরা সৃজনের আবেগ নিয়ে বিশ্বস্রষ্টার সঙ্গে বিশ্বসৃষ্টিতে রত, যেখানে আমরা

যা হয়েছি তার অনেক বেশী হতে চাইছি সেই দিকটির ছবি আমাদের হ'য়ে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন। মানুষকে এত বড় সত্য ক'রে অতি অল্প লোকই দেখেছেন। মানুষের প্রতি অসীম দয়া তো কত মহাত্মা জনের আছে, কিন্তু অসীম শ্রদ্ধা আছে রবীন্দ্রনাথের মতো জন কয়েক দ্রষ্টার। এতটা শ্রদ্ধা আছে বলে'ই তিনি মানুষের তুচ্ছ অভাব অভিযোগ ও তুচ্ছ আবেদন নিবেদনগুলোকে তুচ্ছ বলতে পেরেছেন। তাই নিয়ে মানুষকে দরিদ্র বা কুৎসিত বলতে তাঁর লেখনীতে বেধেছে, কোনোদিন একটিও মানুষকে তিনি কাব্যে বা উপন্যাসে অপমান করেননি, প্রত্যেকেরই স্বপক্ষে কোনো না কোনো বক্তব্য খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর রচনায় "devil" নেই। কেননা বিশ্বসৃষ্টিতে "devil" নেই। সবাই ভালো, কেউ একরকম, কেউ অন্যরকম। সবাই সুন্দর, কেউ একরকম, কেউ অন্যরকম। এবং সবাই রাজা—"আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে।"

রবীন্দ্রনাথের দেশ ও রবীন্দ্রনাথের কাল আমাদের দেশ-কালের সমর্থক না হয় তো ছোট আমরাই, তিনি নন। আমরা অল্প একটু জায়গায় ও ছোট একটি শতাব্দীতে থাকি। তিনি এত বড় জগতে ও এত বিস্তৃত কালে থাকেন যে তাঁর কাছে একটা যুঁই ফুলের সুখ-দুঃখ ত্রিশকোটি মানুষের সুখ-দুঃখকে ছাড়িয়ে যায়, আকাশের যতগুলি তারাকে তিনি চেনেন পৃথিবীর ততগুলি মানুষকে তিনি চেনেন না, এবং হাজার বছর পরে যে অমৃতপিয়াসীরা জন্মাবে তাদের অমৃত দেবার দায়িত্ব তাঁর যত আমাদের খাদ্য পানীয় দেবার দায়িত্ব তাঁর তত নয়। তাঁর পরিপ্রেক্ষিত সর্বদেশ ও সর্বকালব্যাপী, তাই তাঁর রচনায় কোনো দেশ ও কোনো কালের প্রতি অন্যায় পক্ষপাত নেই, তিনি তাঁর বন্ধু বিশ্বস্রষ্টার মতো ন্যায়নিষ্ঠ।

রবীন্দ্রনাথের বাণী সর্বদেশের ও সর্বকালের মর্মের বাণী। এ বাণী

যে আমাদেরও অন্তরতম বাণী এ আমরা ভুলে থাকতে পারি, কিন্তু যখনি শুনি তখনি হৃদয় দুলে ওঠে। এ বাণী যদি খুব ছোট হতো, যদি আমাদের উপস্থিত সমস্যাগুলোকে এক নিঃশ্বাসে সমাধান ক'রে দিতো,তবে আমরা খুশি হতুম, কিন্তু আমাদের খুশির জন্যে এই বিচিত্র বিশ্ব-সৃষ্টির যেমন মাথাব্যথা নেই এর সঙ্গে যিনি আপন সৃষ্টি মিলিয়েছেন তাঁর সৃষ্টিরও তেমনি মাথাব্যথা নেই, তিনি সমধর্মার জন্যে নিরবধিকাল অপেক্ষা করতে পারেন। আমাদের খুশি করা তো বিদূষকের কাজ, ইনি যে রাজা, এঁর আহ্বান আমাদের রাজ্যভার গ্রহণ করতে, বৃহৎ জগতে ও বৃহৎ কালে সকল আদিত্যের শ্রদ্ধাযোগ্য হ'যে সমান সারিতে বসতে, এঁর বাণী—"আপন মাঝারে গোপন রাজারে প্রাণ যেন তোর পায় রে।"

(১৯২৮-২৯)

লণ্ডন

বার্ণার্ড শ

বছর চারেক ব্যাঙ্কের চাকুরি করে বিশ বছর বয়সে বার্ণার্ড শ ডাবলিন ছাড়লেন। ব্যাঙ্কের কাজে তিনি যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন, সে মার্গে সাফল্য ছিল তাঁর করায়ত্ত। কিন্তু তাঁর প্রতিভার মার্গ অন্যতর, ক্ষেত্রও অন্যত্র। এরূপ অস্পষ্ট বোধ নিয়ে তিনি লণ্ডনে গেলেন। সেখানে তাঁর মা ছিলেন সঙ্গীতের শিক্ষয়িত্রী। বড় ঘরের মেয়ে, স্বামী মদ খেয়ে সব উড়িয়ে দিয়েছেন বলে নিজেকে উপার্জনের উপায় দেখতে হয়।

হিতৈষীরা পরামর্শ দিলেন চাকুরি কর, মার সাহায্যে লাগ। কেউ কেউ চাকুরিও যোগাড় করে দিলেন। শ কিন্তু দরিদ্রা মায়ের গলগ্রহ হয়ে বছরের পর বছর কাটালেন। এটা ওটা খুচরো কাজ করেন, কোনো গানের আসরে পিয়ানো বাজান, কোনো সঙ্গীত সমালোচকের সহকারী হয়ে সমালোচনা লিখে দেন। টেলিফোন কোম্পানীতে যোগ দিয়ে বেশী দিন মন লাগে না, তবু সেই উপলক্ষে লণ্ডনের সর্বত্র ঘুরে দেখা হয়। মিউজিয়ম বা আর্ট গ্যালারী যেদিন বিনা মাশুলে খোলা থাকে সেদিন মূর্তি বা ছবি দেখে বেড়ান।

প্রতি রাত্রে পাঁচ পৃষ্ঠা করে লিখতে লিখতে পাঁচ বছরে পাঁচখানা নভেল লিখে ফেললেন। কোনো প্রকাশক সেসব নভেল ছাপল না। তখন তিনি লিখলেন খবরের কাগজে রঙ্গ সমালোচনা। থিয়েটারের, কনসার্টের, প্রদর্শনীর। পাঁচ বছরের নীরব সাধনায় ভাষা শিখেছিলেন। সঙ্গীত তাঁর মায়ের কাছে শেখা, অভ্যাস করে আসছিলেন। আর তাঁর হাস্যরস তাঁর স্বভাবগত। লণ্ডনের শ্রেষ্ঠ বিদূষক বলে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল। অমনি তাঁর উপর হল অর্থবৃষ্টি।

ইতিমধ্যে তিনি কার্ল মার্ক্‌স্ পড়েছিলেন। সোশ্যালিস্ট আন্দোলনের প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়েছিল। ব্যক্তিগত সাফল্যের মোহ তাঁর ছিল না। নতুন সমাজের আইডিয়া তাঁকে সম্পূর্ণ অধিকার করেছিল। তিনি সুযোগ পেলেই বক্তৃতা দিতেন। সেই বক্তৃতাই হাস্যরসের সহিত ওতপ্রোত হয়ে অভিনয় সমালোচনা আকারে পত্রিকার পাতে পরিবেশিত হত। যে মানুষের নিজের কোনো বাঁধন নেই লোভ নেই সংস্কার নেই তাকে ঠেকায় কিসে? তার উপর রাগ করলে সে ভয় পায় না, তাকে গালাগালি দিলে সে তামাসা করে, তার সঙ্গে তর্কে নামলে সে নাকাল করে ছাড়ে।

একটি ছোট থিয়েটারে ইবসেনের নাটক অভিনীত হয়। ইংলণ্ডে কেন অমন নাটক লেখা হয় না? শ বললেন, আচ্ছা, আমি লিখছি। তাঁর প্রথম নাটক "Widowers' Houses" চারিদিকে নিন্দার ঝড় তুলল। তিনি আবিষ্কার করলেন যে তিনি নাটক লিখতে পারেন এবং যা আজ নিন্দার ঝড় তাই কাল স্তুতির ঝড় হবে। তিনি আবিষ্কার করলেন যে থিয়েটারই তাঁর চার্চ, নাটকই তাঁর সার্মন। একদিন চার্চ খালি করে লোক থিয়েটারে আসবে ধর্মের ব্যাখ্যান শুনতে।

তাঁর ধর্ম তিনি ইতিমধ্যে উপলব্ধি করেছিলেন। সেধর্মের তত্ত্ব হচ্ছে ক্রিয়েটিভ ইভলিউশন, আর কর্মকাণ্ড হচ্ছে সোশ্যালিজম্। বিবর্তনবাদ প্রচলিত হয়ে অবধি পরমপিতা পরমেশ্বর যে ক্ষুদ্র কীট থেকে বৃহৎ তিমি পর্যন্ত সকলের এককালীন স্রষ্টা এ ধারণা সুধীজনের পরিত্যক্ত হয়েছিল। কিন্তু বিবর্তন সম্বন্ধে সেকালের লোক ডারউইনকে এক মাত্র প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করায় ব্যক্তিসম্পত্তিবাদীদের বিবেক দরিদ্রের দুঃখ দেখে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করছিল না। অস্তিত্বের জন্যে সংগ্রামে যোগ্যতমের উদ্বর্তন। ধনিকরাই যোগ্যতম, তারাই থাকবে। শ্রমিকরা মরবে। প্রকৃতির নিয়ম যন্ত্রের মতো অমোঘ ও নির্মম। সেই যন্ত্রের

দ্বারা প্রতি-নিয়ত বাছাইয়ের কাজ চলেছে। যারা প্রকৃতির আপন হাতে নির্বাচিত হল তারা পৃথিবীর প্রভু ও ভোক্তা। যারা বাতিল হল তারা ভারবাহী, তারা ভোগ করবে না, তারা ভুগবে।

ডারউইন কথিত বা ডারউইনের প্রতি আরোপিত এই হৃদয়হীন সমাচার কখনো মানুষের নব ধর্ম হতে পারে না, পুরাতন ধর্মের স্থান পূরণ করতে পারে না। এটা ধর্ম নয়, এটা ধনিকতন্ত্রের সাফাই। এ যদি ধর্ম হয় তবে চুরি ডাকাতিও ধর্ম। বার্ণার্ড শ তাই ডারউইনকে উপহাস করলেন। তিনি গেলেন ডারউইনের পূর্বগামী লামার্কের কাছে। প্রাণী আপনাকে ইচ্ছানুযায়ী বিবর্তিত করতে পারে, এত কাল তাই করে এসেছে। চিরকাল তাই করবে। প্রকৃতি একটা যন্ত্র নয়, প্রকৃতি পরীক্ষা করছে, ভুল করছে, ভুল করতে করতে ঠিক করছে, যা ঠিক করছে তাকে বংশানুক্রমিক বৃত্তিতে পরিণত করছে। ইচ্ছা করলেই আমরা আমাদের সমাজের গঠন পরিবর্তন করতে পারি, তার দ্বারা বংশের বিবর্তন ঘটাতে পারি, অতিমানব হয়ে উঠতে পারি। আর তা যদি না করি, যদি যন্ত্রের হাতে আত্মসমর্পণ করি, তবে পরিবর্তন-শীলা পরীক্ষাপরায়ণা প্রকৃতি একদিন আমাদের উপর আস্থাহীন হয়ে অন্য কোনো প্রাণীকে শ্রেষ্ঠতায় উন্নীত করবে। আমাদের প্রতি তার পক্ষপাতের হেতু নেই।

সমাজের গঠন কি রূপ হবে পুরাতন ধর্মপ্রবর্তকগণ তার সূচনা দিয়ে গেছেন। আমরা তার কালোপযোগী সংস্কার সাধন করলে তাই হয়ে দাঁড়ায় সোশ্যালিজম্। সঞ্চয় ও সম্পত্তি প্রায় প্রত্যেক প্রবর্তকের দ্বারা নিন্দিত হয়েছে। যীশু বলেছেন উটের পক্ষে বরং সূচের ছিদ্র দিয়ে যাওয়া সহজ, কিন্তু বড় লোকের পক্ষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ দুষ্কর।

অথচ সম্পত্তি না হলে মানুষের চলে না। চাষ করব, তার জন্যে হাল লাঙল চাই। বাস করব, তার জন্যে এক কাঠা জমি চাই। সম্পত্তি

দোষের নয়, দোষের হচ্ছে ব্যক্তির স্বত্ব। সেইজন্তে সোশ্যালিস্টদের প্রস্তাব সম্পত্তি রাষ্ট্রের অধিকারে যাক, ব্যক্তির যা দরকার তা ব্যক্তি নিক রাষ্ট্রের ভাণ্ডার থেকে। তা নইলে ধনী দরিদ্রের উপর প্রভুত্ব করতে থাকবে, দরিদ্রের সম্পত্তি কিনে নিয়ে তার স্বাধীনতা কিনে নিতে থাকবে। রাষ্ট্র সকলের সম্পত্তি গ্রহণ করে তার পরিচালনা করবে ও লভ্য হতে সকলকে সমান ভাগ দেবে। ব্যক্তির নিজের সঞ্চয় বলে কিছু থাকবে না, কারণ সঞ্চয়ই তো মূলধন, মূলধন থেকেই তো পরকে খাটিয়ে স্বয়ং লাভবান হওয়া। উৎপাদনের উপায় ব্যক্তির হাতে দেওয়া যাবে না, ব্যক্তিকে দেওয়া যাবে কেবল সম্পত্তির ব্যবহার।

রাষ্ট্রের ওপর সর্বময় কর্তৃত্ব অর্পণ করার আনুষঙ্গিক বিপদ এই যে রাষ্ট্রের চালক যারা হবে তারা চালনকার্যে অনিপুণ হতে পারে। নাবিক অনভিজ্ঞ হলে জাহাজের ভরাডুবি। সাধারণত যারা ভোটের জোরে পার্লামেণ্টে যায় ও পার্টির জোরে গভর্ণমেণ্ট দখল করে তাদের মূঢ়তা, অদূরদর্শিতা ও হৃদয়হীনতা এত বেশী যে তাদের স্কন্ধে সকল সম্পত্তি ন্যস্ত করলে সর্বনাশ অনিবার্য। অতএব এক দল অতিমানব চাই। এদের প্রজনন করতে হবে যেমন করে উৎকৃষ্ট বৃষ বা উৎকৃষ্ট অশ্ব প্রজনন করা হয়। সমাজের শ্রেষ্ঠ পুরুষদের দ্বারা হবে আধান, শ্রেষ্ঠ নারীদের দ্বারা ধারণ। পরস্পরের সহিত দাম্পত্য জীবন-যাপনে এদের অরুচি থাকতে পারে, কিন্তু সমাজহিতায় জগদ্‌হিতায় চ এরা সাময়িকভাবে সঙ্গত হবে। ফলে যেসব সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে তারাই হবে সকলের ভাগ্যবিধাতা।

বার্ণার্ড শ'র মতবাদের থেকে অতিমানবের আবশ্যকতা এমন অবিচ্ছেদ্য বলে সে মতবাদ সোশ্যালিস্ট মহলেও উপেক্ষিত। ইংলণ্ডের সোশ্যালিস্টরা অতিমানব চায় না, তারা চায় পক্ষপাতী ভোটার। বেশীর ভাগ ভোট যেদিন তাদের হস্তগত হবে সেদিন তারা অর্থাৎ

তাদের নায়করা রাষ্ট্র পরিচালনা করবে ভোটারের নির্দেশ অনুসারে। ইংলণ্ডের সোশ্যালিস্টরা ডেমোক্রেসীর ওপর আস্থা রাখে। তার মানে বেশীর ভাগ লোকের মত যে একদিন তাদের মতবাদের অনুকূল হবে এ তাদের ধ্রুব বিশ্বাস। তা যদি হয় তবে একে একে রেলপথ, খনি, ব্যাঙ্ক, কলকারখানা, জমি ইত্যাদি রাষ্ট্রের হাতে আসবে, যেমন ইতিমধ্যে ডাকঘর, বেতার ইত্যাদি এসেছে।

রাশিয়ার ওরাও অতিমানবের জন্তে অপেক্ষা করেনি। লেনিনকে যদিও শ্রদ্ধা করে তবু লেনিনকে ওরা অতিক্রম করেছে। অতিমানব আর যাই হোন তিনি ব্যক্তিবিশেষ। ব্যক্তিবিশেষের জন্তে কমিউনিস্ট দর্শনে স্থান নেই। ব্যক্তিকে হতে হবে সমষ্টির সহিত একাত্ম। সমষ্টির চিত্তে যে চেতনা, সমষ্টির মানসে যে কল্পনা, সমষ্টির হৃদয়ে যে আবেগ, সমষ্টির জীবনে যে উদ্দেশ্য, তোমার আমার ব্যক্তিত্বের শিশিরবিন্দু তাই প্রতিফলিত করবে। তুমি আমি সমষ্টির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। তুমি আমি ইউনিট নই, ইউনিট হচ্ছে সমষ্টি। কাউকে যেমন মুখ দেখেই চেনা যায়, কাউকে গলা শুনে, তেমনি সমষ্টিকে চেনা যায় তোমাকে আমাকে দেখে। আমাদের আপন আপন পরিচয় নেই, আমরা সমষ্টির পরিচায়ক।

সমষ্টির উদ্দেশ্য যাদের মধ্যে প্রতিমূর্ত হয়েছে, যারা সমষ্টির অন্তঃকরণস্বরূপ, তারা সমষ্টির পক্ষ থেকে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করবে, নাই বা হল তারা মেজরিটির প্রতিনিধি। তাদের নিজের বলতে কিছু নেই, না ধন না মন। কমিউনিস্ট রাশিয়া, ফাসিস্ট ইটালী ও নাৎসী জার্মানী এক্ষেত্রে একমার্গী। তবে এদের প্রত্যেকে রাষ্ট্রসম্পত্তিবাদী নয়। দ্বিতীয় দুই দেশ কণ্টকের দ্বারা কণ্টকের উচ্ছেদ চায় বলে কণ্টকের অনুকরণ করেছে।

কাজেই প্লেটো যে আশা করেছিলেন দার্শনিকরা শাসক হবে,

পোপরা যে মনে করেছিলেন যাজকরা হবে শাসক, বার্ণার্ড শ যে প্রস্তাব করেছেন অতিমানবরা শাসন করবে এর কোনোটার ললাটে সিদ্ধি লেখা নেই।

তারপর অতিমানবের জন্মতত্ত্ব সম্বন্ধেও আশঙ্কার কারণ রয়েছে। উৎকৃষ্ট ব্যাঘ্র প্রজনন করা যায় না। চিড়িয়াখানায় যে বাঘ জন্মায় সে যতই খাক যতই বাড়ুক যতই শিক্ষা পাক তাকে জঙ্গলে ছেড়ে দিলে সে খাস জংলী বাঘের এক আঁচড়ে মারা পড়বে। তোমার অতিমানব উকালের সঙ্গে বুদ্ধির দ্বন্দ্বে জিতবে না, বেণের সঙ্গে দরাদরির খেলায় হার মানবে, সৈনিকের উচ্চাভিলাষের ওপর হস্তক্ষেপ করতে পারবে না, পলিটিসিয়ানের চালবাজিতে মাৎ হবে।

শ আক্ষেপ করেছেন, তাঁর পুরোনো কথা আজও পুরোনো হয়নি, সমাজ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, আগে চলছে না, মিথ্যা বড়াই করছে প্রগতির নামে।

এ কথা সত্য যে পৃথিবীতে দারিদ্র্য রয়েছে, এবং দারিদ্র্য একটা নিবার্য ব্যাধি। এদিক থেকে দারিদ্র্যের শত্রু ও মানবের মিত্র বার্ণার্ড শ'র শেষ বয়সের আক্ষেপ তাঁর প্রথম বয়সের আপত্তির মতোই সহেতুক।

(১৯৩৫)

আজ এবং আগামী কাল

নানা জনের নানা স্বপ্ন। এ পর্যন্ত প্রায় সকলেই নিশ্চিত জানতেন যে স্বপ্নের সার্থকতার জন্যে আছে স্বর্গ। মর্ত্ত্য কোনো মতে জীবনের দু'টো দিন কাটিয়ে যাবার পান্থশালা। দু'দিনের বাসাকে পাকা করে গড়ে কী হবে? তাই পার্থিব অসুবিধা ও অবিচারগুলোর হাতে হাতে প্রতিকার না করে মানুষ ভাবত একবার স্বর্গে পৌঁছতে পারলে হয়। সেখানে পাপীকে সাজা ও পুণ্যবানকে পারিতোষিক দেওয়া হবে। দরিদ্রের জন্যে তো সেখানকার জায়গা রিজার্ভ করা রয়েছেই। "Theirs is the Kingdom of Heaven." অতএব ধরিত্রীর মতো সহিষ্ণু হয়ে ধরিত্রীকে সহ্য করা যাক্।

পৃথিবীর ছোট বড় ধর্ম্মমতগুলোর রাশি রাশি স্বপ্ন যেখানে আশ্রয় লাভ ক'রে বিশ্বাসীকে বাঁচবার বল জুগিয়ে আসছিল সেই স্বর্গকে ও জন্মান্তরকে সংশয়ের বিষয় ক'রে বিজ্ঞান মানুষকে ইহসর্ব্বস্ব ক'রে তুলেছে। আপাতত ইহলোক ও ইহজন্মই একমাত্র সত্য। অতএব স্বপ্নগুলোর আশ্রয়ভূমি হয়েছে এই একটুখানি পৃথিবী। নানা মানুষের নানা স্বপ্ন পৃথিবীতে নেমে এসে কল্পনা খেলাবার পক্ষে যথেষ্ট ফাঁকা জায়গা না পেয়ে ঠোকাঠুকি বাধিয়েছে। এইখানেই দরিদ্র পাবে তার স্বাচ্ছন্দ্য, নির্য্যাতিত পাবে তার ক্ষতিপূরণ, ক্রীতদাস পাবে তার মুক্তি; অন্ধ পাবে তার দৃষ্টিশক্তি, সবাই পাবে সবাইকার মন যা চায় তাই। এই আদালতে যদি ন্যায়বিচার না ঘটে তবে এর পরে আর আপীল নেই। সমস্ত ইতিহাসে এই হতভাগিনী পৃথিবীর কাছে এতখানি প্রত্যাশা কেউ পোষণ করে নি।

রাতারাতি স্বর্গ রচনা করবার বাসনা নিয়ে বিস্তর লোক বিস্তর প্ল্যান হাজির করেছেন, কিন্তু কার্ল মার্ক্সের সঙ্গে হেনরি ফোর্ডের, মুসোলিনির সঙ্গে এইচ্. জি ওয়েল্‌সের, মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে কাউন্ট কাইজারলিঙের, নলিনীকান্ত গুপ্তের সঙ্গে শিবরাম চক্রবর্ত্তীর গোড়াতেই গরমিল।

"আজকের জগৎ থেকে অতীতের বীজ সম্পূর্ণ ভাবে বিনষ্ট করা"— এই যদি হয় শিবরামের প্ল্যান * তবে এর লজিক-সম্মত পরিসমাপ্তি আত্মহননে। শুধু আত্মহননে নয়, বংশরক্ষা করার আগে আত্মহননে। নতুবা অতীতের বীজাণুর দ্বারা উত্তর পুরুষ ও ভাবীকাল সংক্রামিত হবে।

পুরাতন বছরের ফসলের বীজ থেকে নতুন বছরের ফসল গজায়। সেই বীজ যদি কেবলমাত্র পুরাতন হতো তা হলে ভয়ের কথা ছিল। কিন্তু তার পিছনে আছে অনাদি কালের সংহত সাধনা ও তার ভিতরে একটা ব্রহ্মাণ্ড আত্মবিকাশের অপেক্ষা করছে। কে তাকে বিনষ্ট করবার স্পর্দ্ধা রাখে? বনস্পতি অঙ্কুরিত হবার সময় বীজের ভিতরকার শাঁসকে অঙ্গীভূত করে এবং সেই বীজের শক্তিতে বনস্পতিত্ব পায়। শক্তি যত কালের পুরাতনই হোক তাকে অবজ্ঞা করতে নেই। তাকে ভস্মসাৎ ক'রে নয় আত্মসাৎ ক'রেই আমাদের বৃদ্ধি।

তবে কি আমরা হাত জোড় করে অতীতের উপাসনা করব? না। তাই করে এসেছি এতকাল—যে সম্পত্তিকে ভোগ করার কথা তাকে সিন্দুকে তু'লে রেখেছি। এখন আমাদের প্রাচীন সভ্যতাটাকে ভেঙে সেই সোনা দিয়ে নতুন সভ্যতা গড়তে হবে। আহা, থাক, থাক, পুরাতন প্যাটার্ণের অলঙ্কার, তাকে তার আদিম অবস্থায় অক্ষত রাখো— এ কথা গ্রাহ্য করব না। আবার এমন কথাও গ্রাহ্য করব না যে, প্যাটার্ণটা

---

* আজ এবং আগামী কাল—শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত

সেকেলে ও জিনিসটা ফিট করছে না ব'লে দাও অতখানি সোনা বঙ্গোপসাগরে ডুবিয়ে। ওটা রাগের কথা, অভিমানের কথা। যারা সৃষ্টি করতে চায় তারা রিপুকে প্রশ্রয় দিলে রিপুর হাতেই মরে। সৃষ্টির চেয়ে অনাসৃষ্টিই ক'রে যায় বেশী।

কেবল ভারতবর্ষের অতীত নয় সমগ্র পৃথিবীর অতীতও আমাদের অতীত। আমরা কেবল ভারতবর্ষীয় নই, আমরা মানুষ। আমাদের জন্যে গ্রীক রোমান ঈজিপ্‌সিয়ানরাও তপস্যা করে গেছেন। আমাদের সৃষ্টিকে অতিদূর ভবিষ্যতের যেখানে যত মানুষ আছে সকলের হাতে দেবার মতো ক'রে যেতে হবে। তারা ও জিনিষ ভাঙবে বটে, কিন্তু ওর ভিতরে যেটুকু খাঁটি সোনা থাকবে সেটুকুকে ফেলে দেবে না।

রাশিয়ার প্রতি পক্ষপাতের কারণ দেখিনে। আর সাম্যবাদও সমাজ সৃষ্টির সুসমঞ্জস আদর্শ নয়। মানুষ যে মনে মনে সাম্যকেই একমাত্র ভালোবাসে এর প্রমাণ তার আবহমান কালের ইতিহাসে নেই। সাম্য ও বৈষম্য দুইয়েব প্রতি তার সমান আকর্ষণ। প্রজারঞ্জক রাজাকে সে মাথায় ক'রে রাখে, লোকহিতৈষীর জন্যে প্রাণটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। আবার, মা'র কাছ থেকে বন্ধুর কাছ থেকে আদায়ও করে নেয় তেমনি। এই সব বৈষম্য লোপ পেলে সে ক্ষুব্ধই হবে, একটা সর্দারের জন্যে একটি সর্ব্বস্ব দাবী-করা প্রিয়ার জন্যে তার আকাঙ্ক্ষা অচরিতার্থ থেকে যাবে।

সাম্য ও বৈষম্য এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটাতে হবে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষরাও এ তত্ত্ব জানতেন। কেবল পৃথিবীকে দু'দিনের মনে করায় তাঁদের সামঞ্জস্যের আইডিয়া আর একটা পৃথিবীর অপেক্ষা রেখেছে। তা সত্বে আইডিয়াটার কাঁচা রকম পরিব্যক্তি চিরকালই কোনোনা কোনো সমাজে দেখা গেছে সত্য, কিন্তু আধুনিক মানব যেমনটি চায় তেমনটি নয়। পাছে বড় বেশী নিরাশ হতে হয় সেজন্যে আধুনিক মানবকেও একটি কথা মনে রাখতে হবে। পৃথিবীর প্রতি যেন সে

আসক্ত না হয়ে পড়ে। পৃথিবী তাকে মৃত্যুর হাত থেকে সাবিত্রীর মতো ফিরিয়ে আনতে পারবে না। পৃথিবী তাকে প্রিয়বিয়োগে সান্ত্বনা ও প্রিয়বিরহে উদ্বেগরাহিত্য দিতে জানে না। পার্থিব অবস্থা তার কল্পনাকে ও পার্থিব কর্ত্তব্য তার স্বাধীনতাকে পদে পদে প্রতিহত করবে। পরিশেষে, মানুষে মানুষে যেমন একটা সহজ ঐক্য আছে তেমনি নিগূঢ় বিরোধও আছে। সেটা প্রকৃতিগত এবং ব্যক্তিত্বের সামিল। মানুষ দল বাঁধতে পারে বটে কিন্তু কোনো দলে স্থায়ী হতে পারে না। প্রিয়পরিবৃত হয়েও সে অন্তরে একাকী। সমাজ মানুষকে চরম জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে পারে না।

সুতরাং মোহমুক্ত ভাবেই নতুন সমাজ রচনা করতে হবে।

(১৯৩০)